সম্পাদক
শ্রী প্রেমেন্দ্র মিত্র
দি সিটি বুক কোম্পানী
১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জ্জী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

প্রকাশক—
শ্রীকৃষ্ণনাথ চট্টোপাধ্যায়
দি সিটি বুক কোম্পানী
১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জ্জী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।
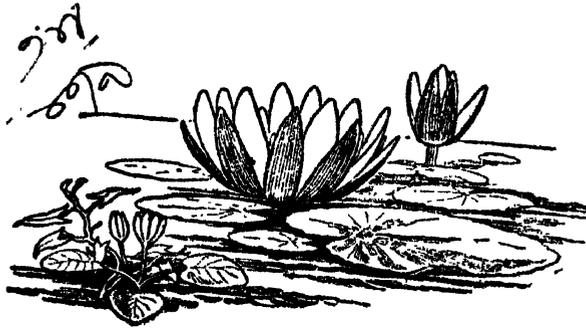
২য় সংস্করণ—১৩৫১ সাল

দাম দুই টাকা চারি আনা মাত্র

প্রিণ্টার—শ্রীবিভূতিভূষণ বিশ্বাস
শ্রীপতি প্রেস
১৪, ডি. এল. রায় ষ্ট্রীট, কলিকাতা
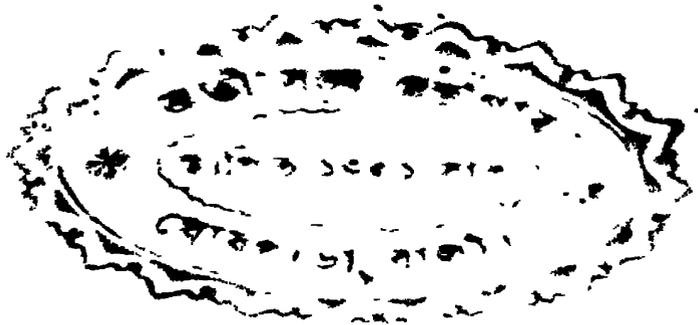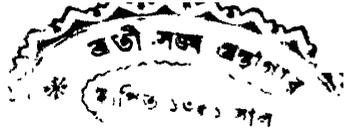
ছোটদের খুশী করা সব চেয়ে সোজা কাজ। খুশীর সুরে তাদের মনের তার টান করে বাঁধাই আছে, একটু শুধু ছুঁয়ে দিলেই হ'ল। তাদের মন অমনি বেজে উঠবে নিজের আনন্দে।

কিন্তু তাদের খুশী করা সোজা বলেই—তার দায়িত্ব বুঝি বেশী কঠিন। রাঙ্‌তা দিয়ে তাদের ভোলান যায় বলেই সোণায় তাদের বঞ্চিত করার মত অপরাধ আর কিছু হতে' পারে না।

'গল্পের মণিমালা'—ছোটদের খুশী করবার জন্যে আমাদের যথাসাধ্য আয়োজন। সাধ যত ছিল, সাধ্যে হয়ত সব কুলোয়নি; তবু ছোটদের অল্পে খুশী সরল মনের সুযোগ নিয়ে, রাঙ্‌তাকে সোণা বলে চালানর চেষ্টা আমরা করিনি—এইটুকু আমাদের সান্ত্বনা ও গর্ব্ব।

পুজোর দিনে অনেক দিক্ থেকে অনেক রকম উপহার ছোটরা পাবে। পরিপূর্ণ আনন্দে এই ত পাবার ও দেবার দিন। শুধু মানুষ নয়, প্রকৃতিও আজ দিল-দরিয়া। কার্পণ্য আজ কোথাও নেই—নেই আকাশের নব নীল মাধুর্য্যে, পৃথিবীর গায় সবুজ বিস্তারে।

এমন দিনে আমাদের এই উপহার ছোটদের হাতে তুলে দিতে পেরে আমরা আনন্দিত।

ছেলেদের হাতে গল্প তুলে দেওয়ার জন্যে কোন কৈফিয়ৎ দরকার হয় না, যেমন দরকার হয় না পাখীকে আকাশে ওড়ার স্বাধীনতা দেওয়ায়।

এই গল্পের অবাধ আকাশে ছোটদের সহজাত অধিকার; তাদের মনের পাখা এই আকাশেই সবল হয়ে উঠে।

ছোটদের জন্যে গল্পের এই মণিমালা গাঁথবার বিশেষ কোন কৃতিত্ব আমি নিজে দাবী করতে পারি কিনা সন্দেহ। এর পরিকল্পনাটি শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসাদ

মুখোপাধ্যায়ের ; তাঁরই উৎসাহ, উদ্যমে ও শ্রীমতী ছবিরাণী রায় চৌধুরী এবং শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রলাল ধরের আন্তরিক সংযোগিতায় সার্থক হয়ে উঠেছে।

অনেকের কাছেই আমরা এ বিষয় সাহায্য পেয়েছি। ব্যক্তিগত ভাবে সকলের কাছে কৃতজ্ঞতা জানান এখানে সম্ভব নয়—তবু শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদলাল দত্ত ও বিনয়ভূষণ চক্রবর্ত্তী পরামর্শ দিয়ে ও প্রুফ দেখায় সাহায্য করে যে উপকার করেছেন, শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য, দেবীপ্রসাদ ঘটক, পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ও শ্রীমতী হাসিরাশী দেবী অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে বইএর ছবিগুলি এঁকে দিয়ে আমাদের যে সুবিধে করে দিয়েছেন এবং মেট্রো প্রিন্টিং ওয়ার্কসের শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মিত্র বইখানি বা'র করার জন্যে অক্লান্তভাবে যে যত্ন নিয়েছেন তার বিশেষ উল্লেখ এখানে না করে পারি না।

এখন যাদের জন্যে গল্পের মণিমালা গাঁথা হ'ল তারা খুশী হ'লেই আমাদের পরিশ্রম ও চেষ্টা সার্থক।

-প্রেমেন্দ্র মিত্র

আশ্বিন

১৩৪৪ সাল।

সূচীপত্র

কোলকাতার নতুন-দা	...	শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	...	১
আলোয় কালোয়	...	শ্রীঅবনীন্দ্র নাথ ঠাকুর	...	১৪
বনের ভিতর নূতন ভয়	...	শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়	...	১৮
অখিলেশ	...	শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার	...	৩২
ফার্ষ্ট প্রাইজ	...	শ্রীজলধর সেন	...	৪০
ফরচুন টেলার	...	শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়	...	৫১
অপমৃত্যু	...	শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়	...	৬১
নীলপরীদের দেশে	...	শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী	...	৭৪
গল্পের শেষে	...	শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র	...	৮৭
হারানো স্নেহের বুকে	...	শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র দাসগুপ্ত	...	১০২
মরণের সঙ্গে মুখোমুখি	...	শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর	...	১১০
সীপ্রার স্বয়ম্বর	...	শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়	...	১২৩

কোলকাতার নতুনদা
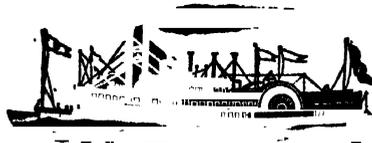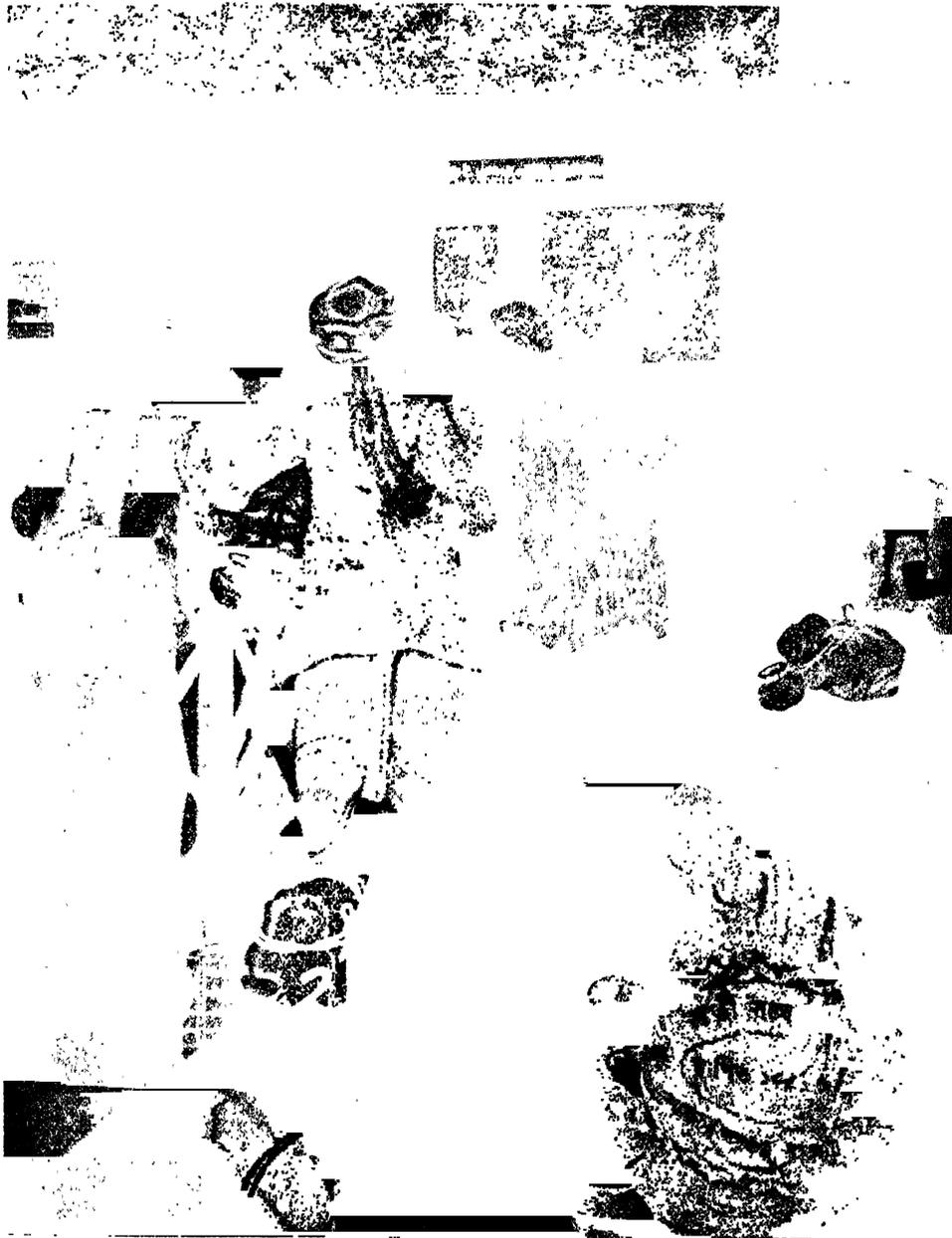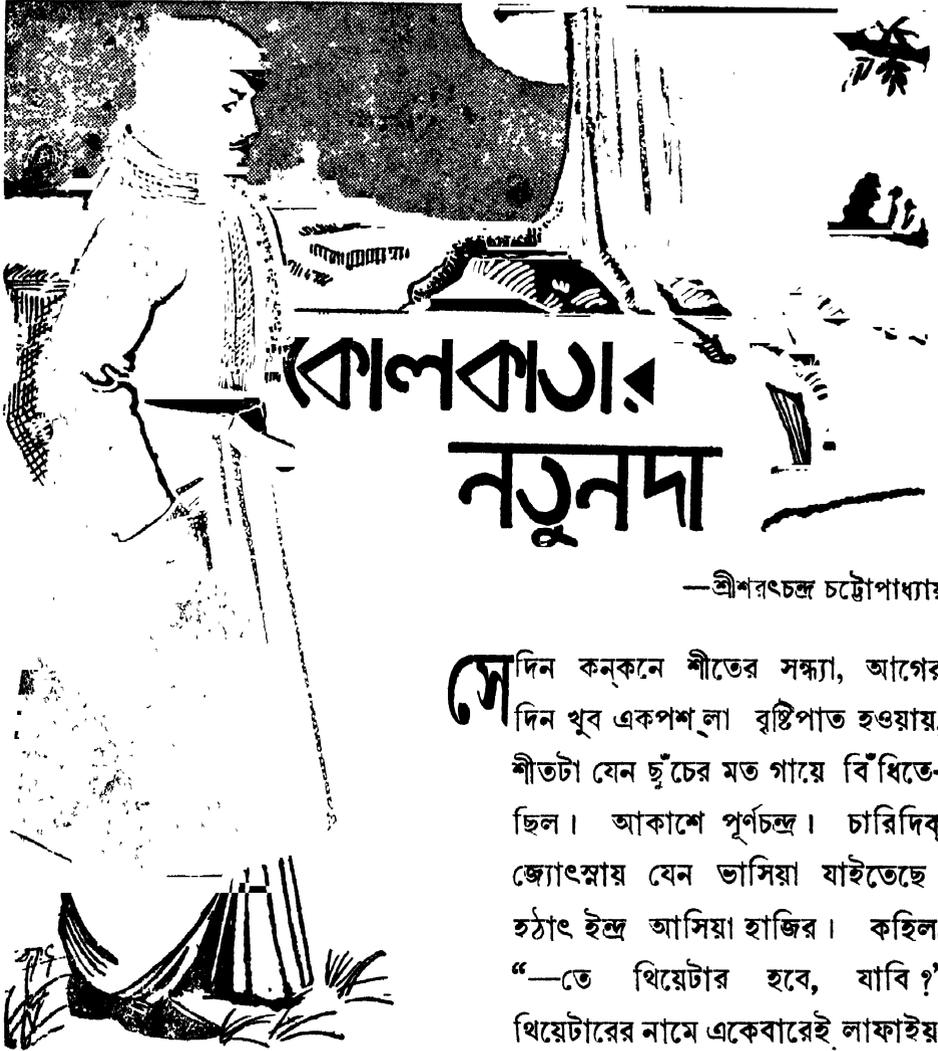
—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সেদিন কন্‌কনে শীতের সন্ধ্যা, আগের দিন খুব একপশ্‌লা বৃষ্টিপাত হওয়ায়, শীতটা যেন ছুঁচের মত গায়ে বিঁধিতেছিল। আকাশে পূর্ণচন্দ্র। চারিদিক্ জ্যোৎস্নায় যেন ভাসিয়া যাইতেছে। হঠাৎ ইন্দ্র আসিয়া হাজির। কহিল, "—তে থিয়েটার হবে, যাবি?" থিয়েটারের নামে একেবারেই লাফাইয়া উঠিলাম। ইন্দ্র কহিল, "তবে কাপড় প'রে শীগ্‌গীর আমাদের বাড়ী আয়।" পাঁচ মিনিটের মধ্যে একখানা র‍্যাপার টানিয়া লইয়া ছুটিয়া বাহির হইলাম। সেখানে যাইতে হইলে ট্রেণে যাইতে হয়। ভাবিলাম, উহাদের বাড়ীর গাড়ী করিয়া ষ্টেশনে যাইতে হইবে—তাই তাড়াতাড়ি।

ইন্দ্র কহিল, "তা' নয়। আমরা ডিঙিতে যাব।"

আমি নিরুৎসাহ হইয়া পড়িলাম। কারণ, গঙ্গায় উজান ঠেলিয়া যাইতে হইলে, বহু বিলম্ব হওয়াই সম্ভব। হয়ত বা সময়ে উপস্থিত হইতেই পারা যাইবে না।

ইন্দ্র কহিল, "ভয় নেই, জোর হাওয়া আছে, দেরী হবে না। আমার নতুন-দা কোলকাতা থেকে এসেচেন, তিনি গঙ্গা দিয়ে যেতে চান।"

যা'ক্, দাঁড় বাঁধিয়া, পাল খাটাইয়া ঠিক হইয়া বসিয়া আছি—অনেক বিলম্বে ইন্দ্রর নতুন-দা আসিয়া ঘাটে পৌছিলেন। চাঁদের আলোকে তাঁহাকে দেখিয়া ভয় পাইয়া গেলাম। কোলকাতার বাবু—অর্থাৎ ভয়ঙ্কর বাবু। সিল্কের মোজা, চক্‌চকে পাম্প্‌সু, আগাগোড়া ওভারকোটে মোড়া, গলায় গলাবন্ধ, হাতে দস্তানা, মাথায় টুপী—পশ্চিমের শীতের বিরুদ্ধে তাঁহার সতর্কতার অন্ত নাই। আমাদের সাধের ডিঙিটাকে তিনি অত্যন্ত 'যা'চ্ছেতাই' বলিয়া কঠোর মত প্রকাশ করিয়া ইন্দ্রর কাঁধে ভর দিয়া, আমার হাত ধরিয়া, অনেক কষ্টে, অনেক সাবধানে নৌকার মাঝখানে জাঁকিয়া বসিলেন।

"তো'র নাম কিরে ?"

ভয়ে ভয়ে বলিলাম—"শ্রীকান্ত।"

তিনি দাঁত খিঁচাইয়া বলিলেন, "আবার শ্রী—কান্ত—শুধু কান্ত। নে, তামাক সাজ্। ইন্দ্র, হুঁকো-কল্‌কে রাখ্‌লি কোথায় ? ছোঁড়াটাকে দে, তামাক সাজুক !"

ওরে বাবা ! মানুষ চাকরকেও ত এমন বিকট ভঙ্গী করিয়া আদেশ করে না ! ইন্দ্র অপ্রতিভ হইয়া কহিল, "শ্রীকান্ত, তুই এসে একটু হাল ধর, আমি তামাক সাজ্‌চি।"

আমি তাহার জবাব না দিয়া তামাক সাজিতে লাগিয়া গেলাম। কারণ তিনি ইন্দ্রর মাসতুত ভাই, কলিকাতার অধিবাসী এবং সম্প্রতি এল্‌-এ পাশ করিয়াছেন। কিন্তু, মনটা আমার বিগ্‌ড়াইয়া গেল। তামাক সাজিয়া হুঁকা হাতে দিতে, তিনি প্রসন্ন-মুখে টানিতে-টানিতে প্রশ্ন করিলেন, "তুই থাকিস্ কোথায় রে, কান্ত? তো'র গায়ে ওটা কালপানা কি রে? র‍্যাপার? আহা, র‍্যাপারের কি শ্রী! তেলের গন্ধে ভূত পালায়। ফুট্‌ছে—পেতে দে দেখি, বসি।"
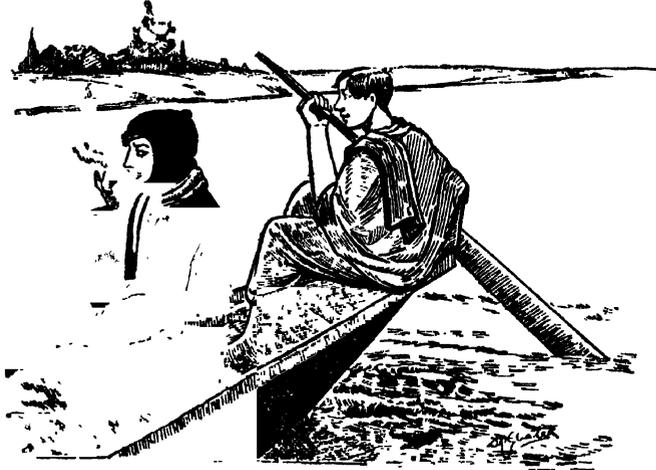
"আমি দিচ্চি, নতুন-দা! আমার শীত কর্‌চে না।—এই নাও" বলিয়া ইন্দ্র নিজের গায়ের আলোয়ানটা তাড়াতাড়ি ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল। তিনি সেটা জড়ো করিয়া লইয়া বেশ করিয়া বসিয়া সুখে তামাক টানিতে লাগিলেন।

শীতের গঙ্গা। অধিক প্রশস্ত নয়—আধ ঘণ্টার মধ্যেই ডিঙি ওপারে গিয়া ভিড়িল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই বাতাস পড়িয়া গেল।

ইন্দ্র ব্যাকুল হইয়া কহিল, "নতুন-দা, এ যে ভারি মুস্কিল হ'ল—হাওয়া প'ড়ে গেল। আর ত পাল চল্‌বে না।"

নতুন-দা জবাব দিলেন, "এই ছোঁড়াটাকে দে-না, দাঁড় টানুক।"

কলিকাতাবাসী নতুন-দাদার অভিজ্ঞতায় ইন্দ্র ঈষৎ ম্লান হাসিয়া কহিল, "দাঁড়! কারুর সাধ্যি নেই, নতুন-দা, এ রেত ঠেলে উজোন ব'য়ে যায়। আমাদের ফির্‌তে হবে।"

প্রস্তাব শুনিয়া নতুন-দা এক মুহূর্ত্তেই একেবারে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিলেন, "তবে আন্‌লি কেন হতভাগা? যেমন ক'রে হোক্, তোকে পৌছে দিতেই হবে। আমার থিয়েটারে হারমোনিয়ম বাজাতেই হবে—তা'রা বিশেষ ক'রে ধরেছে।" ইন্দ্র কহিল, "তা'দের বাজাবার লোক আছে, নতুন-দা। তুমি না গেলেও আট্‌কাবে না।"

"না! আট্‌কাবে না? এই মেড়োর দেশের ছেলেরা বাজাবে হারমোনিয়ম! চল্, যেমন ক'রে পারিস্ নিয়ে চল্।" বলিয়া তিনি যেরূপ মুখভঙ্গী করিলেন, তাহাতে আমার গা জ্বলিয়া গেল। ইহার বাজানা পরে শুনিয়াছিলাম; কিন্তু সে কথায় আর প্রয়োজন নাই।

ইন্দ্রর অবস্থা-সঙ্কট অনুভব করিয়া আমি আস্তে আস্তে কহিলাম, "ইন্দ্র, গুণ টেনে নিয়ে গেলে হয় না?" কথাটা শেষ হইতে না হইতেই আমি চমকিয়া উঠিলাম। তিনি এমনি দাঁত-মুখ ভ্যাংচাইয়া উঠিলেন যে, সে মুখখানি আমি আজিও মনে করিতে পারি। বলিলেন, "তবে যাওনা, টানো গে না হে! জানোয়ারের মত বসে থাকা হচ্ছে কেন?"

তারপরে একবার ইন্দ্র, একবার আমি, গুণ টানিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম। কখনো বা উঁচু পাড়ের উপর দিয়া, কখনো বা নীচে নামিয়া এবং সময়ে সময়ে সেই বরফের মত ঠাণ্ডা জলের ধার ঘেঁসিয়া অত্যন্ত কষ্ট করিয়া চলিতে হইল। আবার তারই মাঝে-মাঝে বাবুর তামাক সাজার জন্য নৌকা থামাইতে হইল। অথচ বাবুটি ঠায় বসিয়া রহিলেন—এতটুকু

সাহায্য করিলেন না। ইন্দ্র একবার তাঁ'কে হালটা ধরিতে বলায়, জবাব দিলেন, তিনি দস্তানা খুলে এই ঠাণ্ডায় নিমোনিয়া কর্‌তে পারবেন না। ইন্দ্র বলিতে গেল, "না খুলে—"

"হাঁ, দামী দস্তানাটা মাটি করে ফেলি আর কি! নে—যা' কর্‌চিস্ কর্।"

বস্তুতঃ, আমি এমন স্বার্থপর, অসজ্জন ব্যক্তি জীবনে অল্পই দেখিয়াছি। তাঁরই একটা অপদার্থ খেয়াল চরিতার্থ করিবার জন্য আমাদের এত ক্লেশ সমস্ত চোখে দেখিয়াও তিনি এতটুকু বিচলিত হইলেন না। অথচ আমরা বয়সে তাঁহার অপেক্ষা কতই বা ছোট ছিলাম। পাছে এতটুকু ঠাণ্ডা লাগিয়া তাঁহার অসুখ করে, পাছে এক ফোঁটা জল লাগিয়া দামী ওভারকোট খারাপ হইয়া যায়, পাছে নড়িলে-চড়িলে কোনরূপ ব্যাঘাত হয়, এই ভয়েই আড়ষ্ট হইয়া বসিয়া রহিলেন এবং অবিশ্রাম চেঁচামেচি করিয়া হুকুম করিতে লাগিলেন।

আরও বিপদ্,—গঙ্গার রুচিকর হাওয়ায় বাবুর ক্ষুধার উদ্রেক হইল এবং দেখিতে দেখিতে সে ক্ষুধা অবিশ্রাম বকুনির চোটে একেবারে ভীষণ হইয়া উঠিল। এদিকে চলিতে চলিতে রাত্রিও প্রায় দশটা হইয়া গেছে—থিয়েটারে পৌঁছিতে রাত্রি দু'টা বাজিয়া যাইবে শুনিয়া, বাবু প্রায় ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিলেন। রাত্রি যখন এগারটা, তখন কলিকাতার বাবু কাবু হইয়া বলিলেন, "হাঁ রে ইন্দ্র, এদিকে খোট্টা-মোট্টাদের বস্তি-টস্তি নেই? মুড়ি-টুড়ি পাওয়া যায় না?"

ইন্দ্র কহিল, "সাম্‌নেই একটা বেশ বড় বস্তি, নতুন-দা, সব জিনিষ পাওয়া যায়।"

"তবে লাগা লাগা—ওরে ছোঁড়া—ঐ—টান্ না একটু জোরে—ভাত খাস্‌নে? ইন্দ্র, বল্ না তোর ঐ ওটাকে, একটু জোর ক'রে টেনে নিয়ে চলুক।"

ইন্দ্র কিংবা আমি কেহই তাহার জবাব দিলাম না। যেমন চলিতেছিলাম তেমনি ভাবেই অনতিকাল পরে একটা গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এইখানে পাড়টা ঢালু এবং বিস্তৃত হইয়া জলে মিশিয়াছিল। ডিঙি জোর করিয়া ধাক্কা দিয়া সঙ্কীর্ণ জলে তুলিয়া দিয়া আমরা দু'জনে হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম।

বাবু কহিলেন, "হাত-পা একটু খেলানো চাই। নামা দরকার।" অতএব ইন্দ্র তাঁহাকে কাঁধে করিয়া নামাইয়া আনিল। তিনি জ্যোৎস্নার আলোকে গঙ্গার শুভ্র সৈকতে পদচারণা করিতে লাগিলেন।

আমরা দু'জনে তাঁহার ক্ষুধাশান্তির উদ্দেশে গ্রামের ভিতরে যাত্রা করিলাম। যদিচ, বুঝিয়াছিলাম, এত রাত্রে এই দরিদ্র ক্ষুদ্র পল্লীতে আহার্য্য সংগ্রহ করা সহজ ব্যাপার নয়, তথাপি চেষ্টা না করিয়াও ত নিস্তার ছিল না। অথচ, তাঁ'র একাকী থাকিতেও ইচ্ছা নাই। সে ইচ্ছা প্রকাশ করিতেই, ইন্দ্র তৎক্ষণাৎ আহ্বান করিয়া কহিল, "চল না, নতুন-দা, একলা তোমার ভয় কর্‌বে,—আমাদের সঙ্গে একটু বেড়িয়ে আস্‌বে, এখানে চোর-চোর নেই, ডিঙি কেউ নেবে না—চল।"

নতুন-দা মুখখানা বিকৃত করিয়া বলিলেন, "ভয়! আমরা দর্জ্জিপাড়ার ছেলে—যমকে ভয় করিনে, তা' জানিস্! কিন্তু তা' ব'লে ছোটলোকদের dirty পাড়ার মধ্যেও আমরা যাইনে। ব্যাটাদের গায়ের গন্ধ নাকে গেলেও আমাদের ব্যামো হয়।" অথচ তাঁহার মনোগত অভিপ্রায়—আমি তাঁহার পাহারায় নিযুক্ত থাকি এবং তামাক সাজি।

কিন্তু আমি তাঁ'র ব্যবহারে মনে মনে এত বিরক্ত হইয়াছিলাম যে, ইন্দ্র আভাস দিতেও, আমি কিছুতেই একাকী এই লোকটির সংসর্গে থাকিতে রাজী হইলাম না। ইন্দ্রর সঙ্গেই প্রস্থান করিলাম।

দর্জ্জিপাড়ার বাবু হাততালি দিয়া গান ধরিয়া দিলেন,—"ঠুন্ ঠুন্ পেয়ালা—"

আমরা অনেক দূর পর্য্যন্ত তাঁহার সেই মেয়েলি নাকি-সুরে সঙ্গীত চর্চ্চা শুনিতে শুনিতে গেলাম।

ইন্দ্র নিজেও তাহার ভ্রাতার ব্যবহারে মনে মনে অতিশয় লজ্জিত ও ক্ষুব্ধ হইয়াছিল। ধীরে ধীরে কহিল, "এরা কোলকাতার লোক কি না, জল হাওয়া আমাদের মত সহ্য করতে পারে না—বুঝ্‌লি না, শ্রীকান্ত?"

আমি বলিলাম,—"হুঁ।"

ইন্দ্র তখন তাঁহার অসাধারণ বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয়—বোধ করি, আমার শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিবার জন্যই দিতে দিতে চলিল। তিনি অচিরেই বি-এ পাশ করিয়া ডেপুটি হইবেন, কথা প্রসঙ্গে তাহাও কহিল। যাই হোক, এত দিন পরে, এখন তিনি কোথাকার ডেপুটি কিম্বা আদৌ সে কাজ পাইয়াছেন কিনা সে সংবাদ জানি না। কিন্তু মনে হয়, যেন পাইয়াছেন, না হইলে বাঙ্গালী ডেপুটির মাঝে মাঝে এত সুখ্যাতি শুনিতে পাই কি করিয়া? তখন তাঁহার প্রথম যৌবন। শুনি, জীবনের এই সময়টায় না কি হৃদয়ের প্রশস্ততা, সমবেদনার ব্যাপকতা যেমন বৃদ্ধি পায়, এমন আর কোন কালে নয়। অথচ, ঘণ্টা কয়েকের সংসর্গেই যে নমুনা তিনি দেখাইয়াছিলেন, এত কালের ব্যবধানেও তাহা ভুলিতে পারা গেল না। তবে ভাগ্যে এমন সব নমুনা কদাচিৎ চোখে পড়ে;—না হইলে, বহু পূর্ব্বেই সংসারটা রীতিমত একটি পুলিশথানায় পরিণত হইয়া যাইত। কিন্তু থাক্ সে কথা।

কিন্তু ভগবানও যে তাঁহার উপর ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন, সে খবরটা পাঠককে দেওয়া আবশ্যক। এ অঞ্চলের পথ-ঘাট, দোকান-পত্র সমস্তই ইন্দ্রর জানা ছিল।

সে গিয়া মুদির দোকানে উপস্থিত হইল। কিন্তু দোকান বন্ধ এবং দোকানদার শীতের ভয়ে দরজা-জানালা রুদ্ধ করিয়া গভীর নিদ্রায় মগ্ন। এই গভীরতা যে কিরূপ অতলস্পর্শী, সে কথা যাহার জানা নাই, তাহাকে লিখিয়া বুঝানো যায় না। ইহারা অম্ল রোগী, নিষ্কর্ম্মা জমিদারও নয়, বহুভারাক্রান্ত, কন্যাদায়-গ্রস্ত বাঙ্গালী গৃহস্থও নয়, সুতরাং ঘুমাইতে জানে। দিনের বেলা খাটিয়া খুটিয়া রাত্রিতে একবার 'চার-পাই' আশ্রয় করিলে ঘরে আগুন না দিয়া, শুধুমাত্র চেঁচাচেঁচি ও দোর-নাড়ানাড়ি করিয়া জাগাইয়া দিব, এমন প্রতিজ্ঞা যদি স্বয়ং সত্যবাদী অর্জ্জুন জয়দ্রথবধের পরিবর্ত্তে করিয়া বসিতেন, তবে তাঁহাকেও মিথ্যা প্রতিজ্ঞাপাপে দগ্ধ হইয়া মরিতে হইত, তাহা শপথ করিয়া বলিতে পারা যায়।

তখন উভয়েই বাহিরে দাঁড়াইয়া তারস্বরে চীৎকার করিয়া এবং যতপ্রকার ফন্দি মানুষের মাথায় আসিতে পারে, তাহার সবগুলি একে একে চেষ্টা করিয়া আধঘণ্টা পরে রিক্ত হস্তে ফিরিয়া আসিলাম। কিন্তু ঘাট যে জন-শূন্য। জ্যোৎস্নালোকে যত দূর দৃষ্টি চলে, তত দূরই যে শূন্য! 'দর্জ্জিপাড়ার' চিহ্নমাত্র কোথাও নাই। ডিঙি যেমন ছিল, তেমনি রহিয়াছে—ইনি গেলেন কোথায়? দুইজনে প্রাণপণে চীৎকার করিলাম—"নতুন-দা!" কিন্তু কোথায় কে! ব্যাকুল আহ্বান শুধু বাম ও দক্ষিণের সু-উচ্চ পাড়ে ধাক্কা খাইয়া অস্পষ্ট হইয়া বারংবার ফিরিয়া আসিল। এ অঞ্চলে মাঝে মাঝে শীতকালে বাঘের জনশ্রুতিও শোনা যাইত। গৃহস্থ কৃষকেরা দলবদ্ধ 'হুড়ারের' জ্বালায় সময়ে সময়ে ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিত। সহসা ইন্দ্র সেই কথাই বলিয়া বসিল,—"বাঘে নিলে নাত রে!" ভয়ে সর্ব্বাঙ্গ কাঁটা দিয়া উঠিল—সে কি কথা! ইতিপূর্ব্বে তাঁহার নিরতিশয় অভদ্র ব্যবহারে আমি অত্যন্ত কুপিত হইয়া উঠিয়াছিলাম সত্য, কিন্তু এত বড় অভিশাপ ত দিই নাই।

সহসা উভয়েরই চোখে পড়িল, কিছুদূরে বালুর উপর কি একটা বস্তু চাঁদের আলোয় চক্‌চক্ করিতেছে। কাছে গিয়া দেখি, তাঁ'রই সেই বহুমূল্য পাম্প্‌সুর এক-পাটি। ইন্দ্র সেই ভিজা বালির উপরেই একেবারেই শুইয়া পড়িল—"শ্রীকান্ত রে! আমার মাসীমাও এসেছেন যে! আমি আর বাড়ী ফিরে যাব না।" তখন ধীরে ধীরে সমস্ত বিষয়টাই পরিস্ফুট হইয়া উঠিতে লাগিল। আমরা যখন মুদীর দোকানে দাঁড়াইয়া তাহাকে জাগ্রত করিবার ব্যর্থ প্রয়াস পাইতেছিলাম, তখন, এই দিকের কুকুর-গুলাও যে সমবেত আর্ত্ত-চীৎকারে আমাদিগকে এই দুর্ঘটনার সংবাদটাই গোচর করিবার ব্যর্থ প্রয়াস পাইতেছিল, তাহা জলের মত চোখে পড়িল! এখনও দূরে তাহাদের ডাক শুনা যাইতেছিল। সুতরাং আর সংশয়মাত্র রহিল না যে, নেকড়ে-গুলা তাঁহাকে টানিয়া লইয়া গিয়া যেখানে ভোজন করিতেছে, তাহারই আশে-পাশে দাঁড়াইয়া সেগুলা এখনও চেঁচাইয়া মরিতেছে।

অকস্মাৎ ইন্দ্র সোজা উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "আমি যাব।" আমি সভয়ে তাহার হাত চাপিয়া ধরিলাম—"পাগল হয়েচ ভাই!" ইন্দ্র তাহার জবাব দিল না। ডিঙিতে ফিরিয়া গিয়া লগিটা তুলিয়া লইয়া কাঁধে ফেলিল। একটা বড় ছুরি পকেট হইতে বাহির করিয়া বাঁ হাতে লইয়া কহিল, "তুই থাক্, শ্রীকান্ত; আমি না এলে ফিরে গিয়ে বাড়ীতে খবর দিস্—আমি চল্‌লুম।"

তাহার মুখ অত্যন্ত পাণ্ডুর, কিন্তু চোখ-দুটো জ্বলিতে লাগিল! তাহাকে আমি চিনিয়াছিলাম। এ তাহার নিরর্থক, শূন্য আস্ফালন নয় যে, হাত ধরিয়া দুটো ভয়ের কথা বলিলেই মিথ্যা দম্ভ মিথ্যায় মিলাইয়া যাইবে। আমি নিশ্চয়ই জানিতাম, কোন মতেই তাহাকে নিরস্ত করা যাইবে না—সে যাইবেই। ভয়ের

সহিত যে চির-অপরিচিত, তাহাকে আমিই বা কেমন করিয়া, কি বলিয়া বাধা দিব! যখন সে নিতান্তই চলিয়া যায়, তখন আর থাকিতে পারিলাম না—আমিও যা' হোক একটা হাতে করিয়া অনুসরণ করিতে উদ্যত হইলাম। এইবার ইন্দ্র মুখ ফিরাইয়া আমার একটা হাত ধরিয়া ফেলিল। বলিল, "তুই ক্ষেপেচিস্ শ্রীকান্ত? তো'র দোষ কি? তুই কেন যাবি?"

তাহার কণ্ঠস্বর শুনিয়া এক মুহূর্ত্তেই আমার চোখে জল আসিয়া পড়িল। কোনমতে গোপন করিয়া বলিলাম, "তোমারই বা দোষ কি ইন্দ্র? তুমিই বা কেন যাবে?"

প্রত্যুত্তরে ইন্দ্র আমার হাতের বাঁশটা টানিয়া লইয়া নৌকায় ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া কহিল, "আমারও দোষ নেই, ভাই, আমিও নতুন-দাকে আনতে চাইনি। কিন্তু, একলা ফিরে যেতেও পার্‌ব না, আমাকে যেতেই হবে।"

কিন্তু আমারও যাওয়া চাই। কারণ, পূর্ব্বেই একবার বলিয়াছি, আমি নিজেও নিতান্ত ভীরু ছিলাম না। অতএব বাঁশটা পুনরায় সংগ্রহ করিয়া লইয়া দাঁড়াইলাম এবং আর বাক্‌বিতণ্ডা না করিয়া উভয়েই ধীরে ধীরে অগ্রসর হইলাম। ইন্দ্র কহিল, "বালির উপর দৌড়ানো যায় না—খবরদার, সে চেষ্টা করিস্ নে। জলে গিয়ে পড়্‌বি।"

সুমুখে একটা বালির ঢিপি ছিল। সেইটা অতিক্রম করিয়াই দেখা গেল, অনেক দূরে জলের ধার ঘেঁসিয়া দাঁড়াইয়া ৫।৭টা কুকুর চীৎকার করিতেছে। যতদূর দেখা গেল, একপাল কুকুর ছাড়া, বাঘ ত দূরের কথা একটা শৃগালও নাই। সন্তর্পণে আরও কতকটা অগ্রসর হইতেই মনে হইল, তাহারা কি একটা কালো-পানা বস্তু জলে ফেলিয়া পাহারা দিয়া আছে। ইন্দ্র চীৎকার করিয়া ডাকিল—"নতুন-দা!"

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
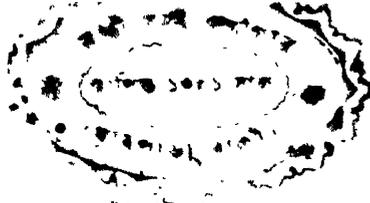
নতুন-দা এক গলা জলে দাঁড়াইয়া অব্যক্ত স্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন—"এই যে আমি।"

দু'জনে প্রাণপণে 'য়া গেলাম ; কুকুরগুলা সরিয়া দাঁড়াইল এবং ইন্দ্র ঝাঁপাইয়া পড়িয়া আকণ্ঠ নিমজ্জিত মূর্চ্ছিতপ্রায় তাহার দর্জ্জিপাড়ার মাসতুত ভাইকে টানিয়া তীরে তুলিল। তখনও তাঁহার একটা পায়ে বহুমূল্য পাম্প্ স্যু, গায়ে ওভারকোট, হাতে দস্তানা, গলায় গলাবন্ধ এবং মাথায় টুপি ;—ভিজিয়া ফুলিয়া ঢোল হইয়া উঠিয়াছে। আমরা গেলে সেই যে তিনি হাততালি দিয়া "ঠুন্ ঠুন্ পেয়ালা" ধরিয়াছিলেন, খুব সম্ভব, সেই সঙ্গীতচর্চ্চাতেই আকৃষ্ট হইয়া গ্রামের কুকুরগুলা দল বাঁধিয়া উপস্থিত হইয়াছিল এবং এই অশ্রুতপূর্ব্ব গীত এবং অদৃষ্টপূর্ব্ব পোষাকের ছটায় বিভ্রান্ত হইয়া এই মহামান্য ব্যক্তিটিকে তাড়া করিয়াছিল।

এতটা আসিয়াও আত্মরক্ষার কোন উপায় খুঁজিয়া না পাইয়া, অবশেষে তিনি জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়াছিলেন; এবং এই দুর্দ্দান্ত শীতের রাত্রে তুষার-শীতল জলে আকণ্ঠ মগ্ন থাকিয়া এই অর্দ্ধঘণ্টাকাল ব্যাপিয়া পূর্ব্বকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতেছিলেন। কিন্তু প্রায়শ্চিত্ত ঘোর কাটাইয়া তাঁহাকে চাঙ্গা করিয়া তুলিতেও সে রাত্রে আমাদিগকে কম মেহন্নত করিতে হয় নাই। কিন্তু সব চেয়ে আশ্চর্য্য এই যে, বাবু ডাঙায় উঠিয়াই প্রথম কথা কহিলেন, "আমার এক-পাটি পাম্প্!"

সেটা ওখানে পড়িয়া আছে—সংবাদ দিতেই, তিনি সমস্ত দুঃখ-ক্লেশ বিস্মৃত হইয়া, তাহা অবিলম্বে হস্তগত করিবার জন্য সোজা খাড়া হইয়া উঠিলেন। তারপরে কোটের জন্য, গলাবন্ধের জন্য, মোজার জন্য, দস্তানার জন্য একে একে পুনঃ-পুনঃ শোক প্রকাশ করিতে লাগিলেন; এবং সে রাত্রে যতক্ষণ পর্য্যন্ত না ফিরিয়া গিয়া নিজেদের ঘাটে পৌঁছিতে পারিলাম, ততক্ষণ পর্য্যন্ত কেবল এই বলিয়া আমাদের তিরস্কার করিতে লাগিলেন—কেন আমরা নির্ব্বোধের মত সে সব তাঁহার গা হইতে তাড়াতাড়ি খুলিতে গিয়াছিলাম। না খুলিলে ত ধুলাবালি লাগিয়া এমন করিয়া মাটি হইতে পারিত না। আমরা খোট্টার দেশের লোক্, আমরা চাষার সামিল, আমরা এ সব কখনো চোখ্‌খে দেখি নাই—এই সমস্ত অবিশ্রাম বকিতে বকিতে গেলেন। যে দেহটাতে ইতিপূর্ব্বে একটি ফোঁটা জল লাগাইতেও তিনি ভয়ে সারা হইতেছিলেন, জামা-কাপড়ের শোকে সে দেহটাকেও তিনি বিস্মৃত হইলেন। উপলক্ষ্য যে আসল বস্তুকেও কেমন করিয়া বহুগুণে অতিক্রম করিয়া যায়, তাহা এই সব লোকের সংসর্গে না আসিলে, এমন করিয়া চোখে পড়ে না।

রাত্রি দু'টার পর আমাদের ডিঙি আসিয়া ঘাটে ভিড়িল। আমার যে

র‍্যাপারখানির বিকট গন্ধে কলিকাতার বাবু ইতিপূর্ব্বে মূর্চ্ছিত হইতেছিলেন, সেইখানি গায়ে দিয়া, তাহারই অবিশ্রাম নিন্দা করিতে করিতে, পা মুছিতেও ঘৃণা হয়, তাহা পুনঃ পুনঃ শুনাইতে শুনাইতে ইন্দ্রর খানি পরিধান করিয়া তিনি সে যাত্রা আত্মরক্ষা করিয়া বাটী গেলেন। যাই হো'ক্, তিনি যে দয়া করিয়া ব্যাঘ্র-কবলিত না হইয়া সশরীরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাঁহার এই অনুগ্রহের আনন্দেই আমরা পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিলাম। এত উপদ্রব-অত্যাচার হাসিমুখে সহ্য করিয়া, আজ নৌকা চড়ার পরিসমাপ্তি করিয়া, এই দুর্জ্জয় শীতের রাত্রে কোঁচার খুঁট্ মাত্র অবলম্বন করিয়া, কাঁপিতে কাঁপিতে বাটী ফিরিয়া গেলাম।
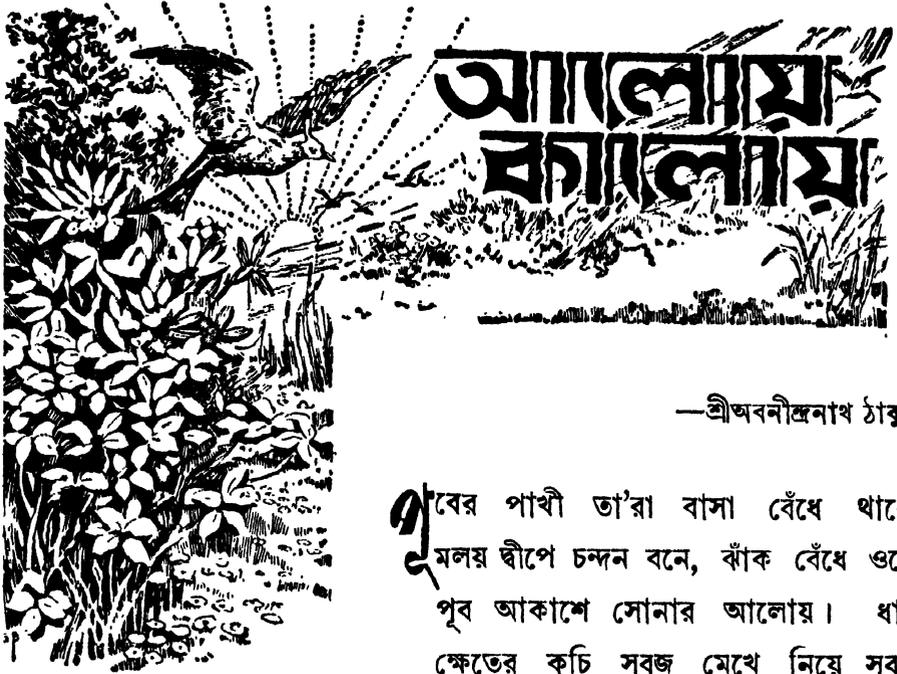
—শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পূবের পাখী তা'রা বাসা বেঁধে থাকে মলয় দ্বীপে চন্দন বনে, ঝাঁক বেঁধে ওড়ে পূব আকাশে সোনার আলোয়। ধান ক্ষেতের কচি সবুজ মেখে নিয়ে সবুজ হ'ল তা'দের ডানা, হিঙ্গুল ফলের কস লেগে হ'ল রাঙা তা'দের ঠোঁট।

তা'র একটি পাখী একদিন ধরা পড়্‌লো। সওদাগর তা'কে জাহাজে ক'রে নিয়ে গেল, উদয়াচল ঘুরে পশ্চিম সাগর পার হ'য়ে, আজব সহরে। সেখানে সবুজ নেই—কেবল বাড়ী, কেবল বাড়ী; ইট, কাঠ, চূণ, সুরকী, কল-কারখানা, ধুঁয়া, ধুলো আর কুয়াসায় দিক্‌বিদিক্‌, আকাশ-বাতাস পর্য্যন্ত ঢাকা; দিনরাত্রি সমান অন্ধকার। আলোগুলো যেন সেখানে জ্ব'ল্‌ছে না—কুয়াসায় ভিজে কম্বল মুড়ি দিয়ে রাস্তার ধারে ব'সে সে জ্বরে কাঁপ্‌ছে। সূর্য্যের রথ সহরের পাঁচিলে এসে ধাক্কা খেয়ে ফিরে যায় সহর ছেড়ে। মলয় বাতাস দুয়োরের কপাট ধরে নাড়া দিয়ে দেখে—কিন্তু ঘর খোলা পায় না কোন দিন!

সবুজ পাখী সেখানে খাঁচায় রইলো—কালো লোহার শক্ত খাঁচা—কলের কুলুপে চাবি দেওয়া খাঁচা। খায় দায় পাখী থেকে থেকে কুলুপ ধরে নাড়া দেয়,—কুলুপ নড়ে চড়ে কিন্তু খোলে না। কল-ঘরের এক কোণে পাখীর খাঁচা—কলের ধুঁয়া থেকে থেকে ভূষো ছিটিয়ে যায় তা'র গায়ে, সবুজ পাখ্‌না কালো হয় দিনে দিনে। পাখী সেখানে থাকে মনের দুঃখে, শুন্‌তে শুন্‌তে শেখে সব খটো-মটো বুলি—যেন লোহার কলের খট্‌খটাং। তাই শুন্‌তে লোক জড় হয়। সেই কলের ছাই-ভস্ম মাখা পাখ্‌না দেখে অবাক হয়ে যায়—একি আশ্চর্য্য পাখী! নাচ্‌তে পারে, গাইতে পারে, বল্‌তে পারে, কইতে পারে, পড়্‌তেও পারে।

পাখী সে থেকে-থেকে নিজের কথা চেঁচিয়ে বলে—"ওরে উড়্‌তে পারিনে রে, উড়্‌তে পারিনে—বেঁচে আমি ম'রে আছি।" থেকে থেকে রাগ ক'রে গা ঝাড়া দেয়—লোকে তা'র মনের কথা বোঝে না, তামাসা দেখে হাসে আর হাততালি দেয়। আজব সহরের মানুষ তারা কেউ বোঝে না মলয় দ্বীপের পাখীর কি দুঃখ—তা'র দুঃখুটা বোঝে শুধু ভোরের আলো। সে কোন দিন কুয়াসা সরিয়ে কারখানা ঘরের কোণ্‌টিতে এসে দেখা দেয়, সবুজ পাখীর গায়ে হাত বুলায়। ভয়ে ভয়ে আসে আলো, ভয়ে ভয়ে সরে যায়।

পাখী বলে—"যদি কোন দিন সিন্ধু পারে যাও হে আলো, তবে ভুলোনা, মলয় দ্বীপে সবুজ ঘরে আমার খবর পৌঁছে দিও; বোলো আমি বেঁচে ম'রে আছি।"

আলো বলে—"যেদিন আমি বড় হ'য়ে উঠ্‌বো, সেদিন নিশ্চয়, নিশ্চয় তোমার কথা তোমার আপনার লোকের কাছে জানিয়ে আস্‌বো।"

শীত কাট্‌লো, পরিষ্কার হোলো দিনে দিনে আকাশ, আলোর তেজ

বড়েই চল্লো। আর সে ভয়ে ভয়ে আসে না, অন্ধকারের ঘরে আসে রাণীর মত
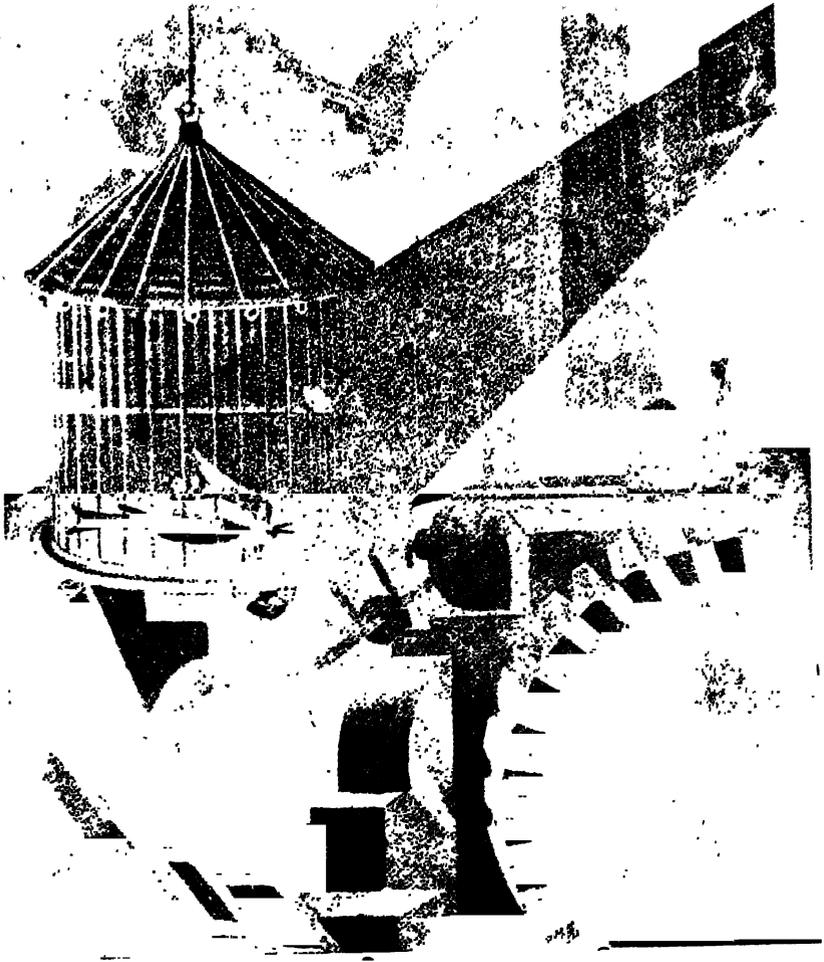
চারিদিক্ আলো ক'রে—কারখানার কলকব্জা ঝক্‌ঝক্ করতে থাকে আলো পেয়ে। পাখী আলোমাখা ডানা কাঁপিয়ে বলে—"আর কেন? এইবার—"

আলো বলে—"থাকো, থাকো, আজ রাতের শেষে খবর পাবে।"

খাঁচায় পাখী ছট্‌ফট্‌ করে—সকাল কখন হয় তা'রই আশায়।

সেদিন ভোরের বেলায় কলের খাঁচায় ধরা ক্লান্ত পাখী ঘুমিয়ে গেল, সেই সময় কলখানায় বাঁশী ডাক দিলে কুলীদের।

পাখীর কাছে আলো এসে বল্লে চুপি চুপি—"মলয় দ্বীপে গিয়েছিলেম, তা'দের তোমার দুঃখের খবর দিলেম।"

পাখী ঘুমন্ত চোখ একটু খুলে শুধোল—"তা'রা কি ব'লে পাঠালে বল, শুনি।"

আলো খাঁচার মধ্যে এগিয়ে এসে বল্লে—"সবাই আহা কর্‌লে, কেবল একটি পাখী সে যেমন ছিল তেমনি রইল।"

পাখী ঘাড় তুলে বল্লে—"তারপর?"

আলো তা'র পিঠে হাত বুলিয়ে বল্লে—"তারপর সে ঝরা পাতার মতো গাছের তলায় লুটিয়ে পড়্‌লো ধুলোতে। আর সবাই বল্লে—'আহা ম'রে বাঁচলো রে'!"

খাঁচার পাখী আর কোন সাড়া দিলে না। কলঘরের কল চল্লো তেজে—খট্‌খটাং। যার পাখী সে খাঁচার কাছে এসে দেখ্‌লে—পাখী ম'রে গেছে, আলো তা'র উপর প'ড়ে কাঁদ্‌ছে।

—শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

—এক—

কুচবিহার থেকে মোটর ছুটেছে—আলিপুর গেল, কুমারগ্রাম পিছনে প'ড়ে রইল, গাড়ী এখন জয়ন্তীর দিকে অগ্রসর হচ্ছে।

বিমল ও কুমার শিকারে বেরিয়েছে। কুমারের মেসোমহাশয় কুচবিহারে বড় চাকরী করেন, তাঁ'রই নিমন্ত্রণে কুমার ও তা'র বন্ধু বিমল কুচবিহারে এসে আজ কিছুদিন ধ'রে বাস কর্‌ছে। তা'দের শিকারের তোড়্‌জোড় ক'রে দিয়েছেন তিনিই।

জয়ন্তীতে কুচবিহারের মহারাজার শিকারের একটি ঘাঁটি বা আস্তানা আছে। স্থির হয়েছে, বিমল ও কুমার দিন দুই-তিন সেখানে থাকবে এবং শিকারের সন্ধান কর্‌বে। জয়ন্তীর অবস্থান হচ্ছে কুচবিহার ও ভুটানের সীমান্তে। এখানকার নিবিড় বনে বাঘ ও অন্যান্য হিংস্র জন্তুর অভাব নেই।

শীতের বৈকাল। রোদের আঁচ্ ক'মে আসার সঙ্গে-সঙ্গেই পাহাড়ে-শীতের আমেজ একটু-একটু ক'রে বেড়ে উঠ্‌ছে। ধূলোয় ধূসরিত আঁকা-বাঁকা পথের

দুইপাশে চাষাদের গ্রামগুলো গাছপালার ছায়ায় গা এলিয়ে দিয়েছে। এপাশে ওপাশে বুনো কুলগাছের ঝোঁপের পর ঝোঁপ। মাঠে মাঠে যে গরুগুলো চরছে, তা'দের কোন-কোনটা মোটর দেখে নতুন কোন দুষ্ট জন্তু ভেবে ল্যাজ তুলে তেড়ে আস্‌ছে এবং দেশী কুকুরগুলোও গাড়ীর শব্দে ঘুম ভেঙে যাওয়াতে ক্ষাপ্পা হয়ে ঘেউ ঘেউ ক'রে ধমকের পর ধমক দিচ্ছে।

এই সব দেখতে দেখতে ও শুনতে শুনতে সন্ধ্যার ছায়া ঘন হ'য়ে উঠল এবং গাড়ীও জয়ন্তীর ঘাঁটিতে গিয়ে পৌঁছলো।

একতালা-সমান উঁচু শালকাঠের খুঁটির উপরে শিকারের এই ঘাঁটি বা কাঠের বাংলো। একজন কুচবিহারী রক্ষী এখানে থাকে। আগেই তা'কে খবর দেওয়া হয়েছিল, সে এসে গাড়ী থাকে মোটঘাট নামিয়ে নিতে লাগল।

একটি কাঠের সিঁড়ি দিয়ে বিমল ও কুমার বাংলোর উপরে গিয়ে উঠল। সেখান থেকে চারিদিকের দৃশ্য টার্ণারের আঁকা একখানি ছবির মত।

একদিকে ভুটানের পাহাড় আকাশের দিকে মটুক-পরা মাথা তুলে সগর্ব্বে দাঁড়িয়ে আছে এবং তা'র নীচের দিক্‌টা গভীর জঙ্গলে ডুব দিয়ে অদৃশ্য। অস্তগত সূর্য্যের ফেলে যাওয়া খানিকটা রাঙা রং তখনো আকাশকে উজ্জ্বল ক'রে রাখবার জন্যে ব্যর্থ চেষ্টা কর্‌ছিল। পাৎলা অন্ধকারে চারিদিক্ ঝাপ্‌সা হয়ে গেছে। পৃথিবীর সমস্ত শব্দ ক্রমেই যেন ঝিমিয়ে পড়ছে এবং বহুদূর থেকে মাঝে মাঝে ভেসে আসছে দুই-একটা গরুর হাম্বা রব।

বিমল পাহাড় ও অরণ্যের দিকে তাকিয়ে বললে, "কুমার, ও-জঙ্গলে কেবল বাঘ নয়, হাতীও থাকতে পারে।"

কুমার বললে, "ভালোই তো, কলতাতায় অনেক দিন ধ'রে লক্ষ্মীছেলের মত হাত গুটিয়ে ব'সে আছি, একটুখানি নূতন উত্তেজনা আমাদের দরকার হয়েছে।"

—দুই—

কিন্তু সেবারে উত্তেজনা এল সম্পূর্ণ নূতন রূপ ধ'রে, অপ্রত্যাশিত ভাবে।

কুচবিহারী শীত ভুটানের সীমান্তে দার্জ্জিলিংয়ের প্রায় কাছাকাছি যায়। সন্ধ্যার অন্ধকার সঙ্গে ক'রে যে শীত নিয়ে এল, তিনটে পুরু গরম জামার উপরে মোটা আলোয়ান চাপিয়েও তা'র আক্রমণ ঠেকানো যায় না।

রক্ষী ঘরের ভিতরে এসে জিনিষ-পত্তর গুছোচ্ছে, বিমল তা'কে ডেকে জিজ্ঞাসা করলে, "ওহে, তোমার নামটি কি শুনি?"

—"আজ্ঞে, শ্রীনিধিরাম দাস।"

—"আচ্ছা নিধিরাম, তুমি এখানে কতদিন আছ?"

—"আজ্ঞে, অনেক দিন!"

—"কাল ভোরে আমরা যদি বেরুই, কাছাকাছি কোথাও কোন শিকার পাওয়া যাবে?"

—"আজ্ঞে, ঐ জঙ্গলে বরা (বরাহ) তো পাওয়া যাবেই, বাঘও আছে। কাল রাত্তেই আমি বাঘের ডাক শুনেছি। আজ সকালে উঠে দেখেছি, কাছেই একটা ঝোঁপে বাঘে গরু মেরে আধখানা খেয়ে ফেলে রেখে গেছে।"

—"তা'হলে গরুর বাকি আধখানা খাবার লোভে বাঘটা হয়তো বেশী দূরে যায়নি। নিধিরাম, জঙ্গল ঠেঙাবার জন্যে কাল আমার সঙ্গে জনকয়েক লোক দিতে পারো?"

নিধিরাম একটু ভেবে বললে, "হুজুর, লোক পাওয়া শক্ত হবে!"

—"কেন, আমরা তাদের ভালো ক'রেই বখ্‌শিস্‌ দেব!"

—"সে তো জানি হুজুর! হপ্তাখানেক আগে হ'লে যত লোক চাইতেন দিতে পারতুম, কিন্তু এখন ডবল বখ্‌শিস্‌ দিলেও বোধ হয় লোক পাওয়া যাবে না!"

বিমল বিস্মিত স্বরে বললে, "কেন নিধিরাম, হপ্তাখানেকের মধ্যেই এখানে কি বাঘের উপদ্রব বড় বেড়েছে ?"

নিধিরাম মাথা নেড়ে বললে, "না হুজুর, বাঘের সঙ্গে থেকে থেকে এখানকার লোকের কাছে বাঘ গা-সওয়া হয়ে গেছে ! বাঘকে আমরা খুব বেশী ভয় করি না, কারণ সব বাঘ মানুষ খায় না।"

কুমার এগিয়ে এসে বিমলের হাতে এক পিয়ালা কফি দিয়ে বললে, "নিধিরাম, তোমার কথার মানে বোঝা যাচ্ছে না ! বাঘের ভয় নেই, তবু লোক পাওয়া যাবে না কেন ?"

নিধিরাম শুষ্কস্বরে বললে, "হুজুর, বনে এক নতুন ভয় এসেছে !"

বিমল বললে, "নতুন ভয় !"

কুমার বললে, "নিধিরাম বোধ হয় পাগ্‌লা হাতীর কথা বলছে !"

নিধিরাম প্রবল মাথা-নাড়া দিয়ে বললে, "না হুজুর, বাঘও নয়—পাগ্‌লা হাতী-টাতিও নয় ! এ এক নতুন ভয় ! এ ভয় যে কি, এর চেহারা যে কি-রকম, কেউ তা' জানে না ! কিন্তু সকলেই বলছে, এই নতুন ভয় ঐ পাহাড় থেকে নেমে বনে এসে ঢুকেছে !"

বিমল ও কুমারের বিস্ময়ের সীমা রইল না, তারা পরস্পরের সঙ্গে কৌতূহলী দৃষ্টি বিনিময় করলে।

নিধিরাম বললে, "জানেন হুজুর, এই নতুন ভয় এসে এক হপ্তার ভেতরে তিনজন মানুষকে প্রাণে মেরেছে ?"

—"বল কি !"

—"আজ্ঞে হ্যাঁ। ছিদাম একদিন বনের ভেতরে গিয়েছিল। হঠাৎ সে চীৎকার করতে করতে বন থেকে বেরিয়ে এল। তারপর ধড়াস্ ক'রে

মাটিতে প'ড়ে ম'রে গেল! সকলে ছুটে গিয়ে দেখলে, তা'র ডান পায়ের ডিমে একটা বাণ বিঁধে আছে!"

—"বাণ?"

—"হ্যাঁ, ছোট একটি বাণ! এক বিঘতের চেয়ে বড় হবে না! কোন মানুষ ধনুক থেকে সে-রকম বাণ ছোঁড়ে না!"

কুমার প্রায় রুদ্ধশ্বাসে বললে, "তারপর?"

—"দিন-চারেক আগে এক কাঠুরেও দুপুর-বেলায় বনের ভেতর থেকে তেম্‌নি চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে বেরিয়ে এসে মাটিতে প'ড়ে ছট্‌ফট্ করতে করতে মারা পড়ল! তারও গোড়ালির ওপরে তেম্‌নি একটা ছোট বাণ বেঁধা ছিল!"

—"তারপর, তারপর?"

—"কাল বনের ভেতরে আমাদের গাঁয়ের অছিমুদ্দীর লাস পাওয়া গেছে। তা'র পায়ের ওপরেও বেঁধা ছিল সেইরকম একটা ছোট বাণ! বলুন হুজুর, এর পরেও কেউ কি আর ঐ বনের ভেতরে যেতে ভরসা করে?"

বিমল ও কুমার স্তব্ধ ভাবে কফির পিয়ালায় চুমুক দিতে লাগল।

শূন্য পিয়ালাটা রেখে দিয়ে বিমল ধীরে ধীরে বললে, "নিধিরাম, তুমি যা' বললে তা' ভয়ের কথাই বটে! তিন-তিনটি মানুষের প্রাণ যাওয়া কি যে-সে কথা? কিন্তু যা'রা এই খুন করেছে তা'দের কোন সন্ধানই কি পাওয়া যায়নি?"

—"কিছু না হুজুর! লোকে বলে, এ মানুষের কাজ নয়, এত ছোট বাণ কোন মানুষ কখনো ছুড়েছে ব'লে শোনা যায়নি!"

—"প্রত্যেক বাণই এসে বিঁধেছে পায়ের ওপরে, এও একটা অদ্ভুত ব্যাপার!"
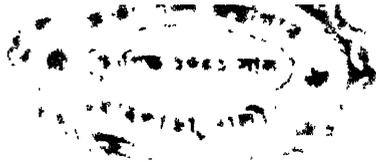
—"আজ্ঞে হ্যাঁ, কোন বাণই পায়ের ডিম ছাড়িয়ে ওপরে ওঠেনি!"

—"আর পায়ে কেবল অতটুকু বাণ বিঁধলে মানুষ মারা পড়ে না, কাজেই বোঝা যাচ্ছে, বাণের মুখে বোধ হয় বিষ মাখানো ছিল!"

—"কব্‌রেজ-মশাইও লাসগুলো দেখে ঐ কথাই বলেছেন!"

বিমল বললে, "একটা বাণ দেখতে পেলে ভাল হ'ত!"

—"দেখবেন হুজুর? আমি এখনি একটা বাণ নিয়ে আসছি"—এই ব'লে নিধিরাম ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

বিমল জানলা দিয়ে কুয়াসামাখা ম্লান চাঁদের আলোয় অস্পষ্ট অরণ্যের দিকে তাকিয়ে বললে, "কুমার, অ্যাড্‌ভেঞ্চার বোধ হয় আমাদের অনুসরণ করে—কাল আমরাও ঐ বনের ভিতরে প্রবেশ করব! কে জানে, শিকার করতে গিয়ে আমরাই কারুর শিকার হব কিনা!"

কুমার বললে, "কিন্তু এমন অকারণে নরহত্যা করার তো কোন অর্থ হয় না!"

বিমল বললে, "হয়তো বনের ভিতরে কোন পাগল আড্ডা গেড়ে বসেছে! নইলে এত জায়গা থাকতে পায়েই বা বাণ মারে কেন?"

এমন সময় নিধিরামের পুনঃপ্রবেশ। তার হাতে একটা কাগজের মোড়ক, সে খুব ভয়ে ভয়ে সেটাকে বিমলের হাতে সমর্পণ করলে।

বিমল মোড়কটা খুলে 'টর্চ্চে'র তীব্র আলোকে জিনিষটা খানিকক্ষণ ধ'রে পরীক্ষা করলে, কুমারও তার পাশে দাঁড়িয়ে সাগ্রহে ঝুঁকে প'ড়ে দেখতে লাগল।

মুখে বিস্ময়ের স্পষ্ট আভাস জাগিয়ে বিমল বললে, "কুমার, দেখছ?"

—"কি?"

—"এ তো বাণের মত দেখতে নয়! এ যে ঠিক ছোট্ট একটি খেলাঘরের বর্শার মতন দেখতে!"

সত্যই তাই। এক বিঘৎ লম্বা পুঁচকে একটি কাঠি, তার ডগায় খুব ছোট্ট এক ইস্পাতের চকচকে ফলা! অবিকল বর্ষার মত দেখতে!

কুমার বললে, "মানুষ যদি দূর থেকে এই একরত্তি হাল্‌কা বর্ষা ছোড়ে, তাহ'লে নিশ্চয়ই তার লক্ষ্য স্থির থাকবে না!"

বিমল ভাবতে ভাবতে বললে, "তাইতো, এ যে মনে বড় ধাঁধাঁ লাগিয়ে দিলে! হ্যাঁ নিধিরাম, বনের ভিতরে অছিমুদ্দীর লাস যেখানে পাওয়া গেছে, অন্ততঃ সেই জায়গাটা কাল আমাদের দেখিয়ে দিয়ে আসতে পারবে তো?"

নিধিরাম বললে, "তা যেন পারব, কিন্তু হুজুর, এর পরেও কি আপনারা ঐ ভূতুড়ে বনে যেতে চান?"

বিমল হেসে বললে, "ভয় নেই নিধিরাম, এত সহজে মরবার জন্যে ভগবান্ আমাদের পৃথিবীতে পাঠান নি, তুমি নিশ্চিন্ত থাকো! আমরা কাল সকালেই ঐ বনের ভিতরে ঢুকতে চাই! কুমার, আমাদের শিকারী-বুট পরতে হবে কারণ এই অদ্ভুত শত্রুর দৃষ্টি হাঁটুর নীচে পায়ের উপরেই!"

—তিন—

ঐটুকু পল্‌কা কাঠির তীর বা বর্ষা যে শিকারী-বুট ভেদ করতে পারবে না, বিমল এটা বেশ বুঝতে পেরেছিল। শরীরের অন্যান্য স্থানেও তারা ডবল ক'রে জামা প্রভৃতি চড়িয়ে, দুটো পা-পর্য্যন্ত-ঝোলা ওভার-কোট প'রে নিলে।

বিমল বললে, "সাবধানের মার নেই, কি-জানি, বলা তো যায় না!"

উপর-উপরি দুই-দুই পিয়ালা কফি পান ক'রে হাড়ভাঙা শীতের ঠক্‌ঠকানি যতটা-সম্ভব কমিয়ে বিমল ও কুমার বাংলো থেকে নীচে নেমে এল। সাম্‌নের বনের মাথায় দূরে তখনো কুয়াসার পাৎলা মেঘ জ'মে আছে। কাঁচা রোদ

চারিদিকে সোনার জল ছড়া দিচ্ছে, ভোরের পাখীদের মনের খুসি আকাশে-বাতাসে ছড়িয়ে যাচ্ছে গানে গানে।

নিধিরাম, বিমল ও কুমারের মাঝখানে থেকে ভয়ে ভয়ে চারিদিকে তাকাতে তাকাতে এগিয়ে আসছিল। তার ভাব দেখলেই স্পষ্ট বোঝা যায়, সামান্য বিপদের আভাস পেলেই সে সর্ব্বাগ্রে অদৃশ্য হবার জন্যে প্রস্তুত হয়েই আছে! একটা পায়ে-চলা পথ ধ'রে তারা যখন একেবারে বনের কাছে এসে পড়ল, নিধিরামের সাহসে আর কুলালো না, হঠাৎ হেঁট হয়ে সেলাম ঠুকে সে বললে, "হুজুর, ঘরে আমার বৌ আছে, ছেলে-মেয়ে আছে, আমি গোঁয়ারের মত প্রাণ দিতে পারব না!"

কুমার হেসে বললে, "তোমাকে বলি দেবার জন্যে আমরা ধ'রে আনিনি, নিধিরাম! খালি দেখিয়ে দিয়ে যাও, অছিমুদ্দীর লাস কোথায় পাওয়া গিয়েছিল!"

—"ঐখানে হুজুর, ঐখানে! বনের ভেতরে ঢুকেই এই পথটা যেখানে ডান দিকে ফিরে গেছে, ঠিক সেইখানে!"—ব'লেই নিধিরাম সেলাম ঠুকতে ঠুকতে তাড়াতাড়ি স'রে পড়ল!

বিমল ও কুমার আর কিছু না ব'লে নিজেদের বন্দুক ও রিভলভার ঠিক আছে কিনা পরীক্ষা ক'রে দেখলে। তারপর সাবধানে বনের ভিতরে প্রবেশ করলে।

সব বন যেমন হয় এও তেমনি! বড় বড় গাছ ঝাঁকড়া ডালপাতাভরা মাথাগুলো পরস্পরের সঙ্গে ঠেকিয়ে যেন সূর্য্যের আলো যাতে ভিতরে ঢুকতে না পারে, সেই চেষ্টা করছে! গাছের ডালে ডালে ঝুলছে অজানা বন্য লতা এবং গাছের তলার দিক্ অদৃশ্য হয়ে গেছে ঝোঁপে-ঝাপে আগাছায়।

কিন্তু সব বন যেমন হয় এও তেমনি বন বটে, তবু এখানকার প্রত্যেক

দৃশ্যের ও প্রত্যেক শব্দের মধ্যে এমন একটা অদ্ভুত রহস্য মাখানো আছে, এই বনকে যা সম্পূর্ণ নূতন ও অপূর্ব্ব ক'রে তুলেছে!

পথ যেখানে ডানদিকে মোড় ফিরেছে সেখানে রয়েছে একটা মস্ত-বড় ঝোঁপ।

সেইখানে দাঁড়িয়ে প'ড়ে বিমল বললে, "এইখানেই অছিমুদ্দী পৃথিবীর খাতা থেকে নাম কাটিয়েছে! কুমার, এ ঝোঁপে অনায়াসেই প্রকাণ্ড বাঘ থাকতে পারে! লুকিয়ে আক্রমণ করার পক্ষে এ একটা চমৎকার জায়গা!"

কুমার সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে একবার ঝোঁপটার দিকে তাকালে, তারপর হঠাৎ একটানে বিমলকে সরিয়ে এনে উত্তেজিত-- কিন্তু মৃদু কণ্ঠে বললে, "ও ঝোঁপে সত্যিই বাঘ রয়েছে!"

চোখের নিমেষে দুজনে বন্দুক তুলে তৈরি হয়ে দাঁড়াল!

বিমল বললে, "কৈ বাঘ?"

—"ঝোঁপের বাঁ-পাশে তলার দিকে চেয়ে দেখ!"

ঝোঁপের তলায় বড় বড় ঘাসের ফাঁক দিয়ে আবছা-আলোতে মস্ত একটা বাঘের মুখ দেখা গেল! মাটির উপরে মুখখানা স্থির হয়ে প'ড়ে আছে,— এমন উজ্জ্বল ভোরের আলোতেও ব্যাঘ্র-মহাশয়ের নিদ্রাভঙ্গ হয়নি!

তারা দুজনেই সেই মুখখানা লক্ষ্য ক'রে একসঙ্গে বন্দুক ছুড়লে, কিন্তু বাঘের মুখখানা একটুও নড়ল না!

দুটো বন্দুকের ভীষণ গর্জ্জনে যখন সারা বন কেঁপে উঠল, গাছের উপরকার পাখীগুলো সভয়ে কলরব করতে করতে চারিদিকে উড়ে পালালো, তখন বিমল ও কুমার বাঘের মুখের দিকে স্থির-দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল ব'লে আর-একটা বিচিত্র ব্যাপার দেখতে পেলে না!

বন্দুকের শব্দ-হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে আশে-পাশের ঝোঁপের তলাকার দীর্ঘ ঘাসবনগুলো হঠাৎ যেন জ্যান্তো হয়ে উঠল—যেন তাদের ভিতর দিয়ে অনেকগুলো ছোট ছোট জীব চম্‌কে এদিকে-ওদিকে ছুটে পালাচ্ছে! সেগুলো খরগোসও হ'তে পারে, সাপও হ'তে পারে!

বিমল আশ্চর্য্য হয়ে বললে, "ঘুমন্ত বাঘ গুলি খেয়েও একটু নড়ল না! তবে কি ওটা মরা বাঘ?"

দুজনে পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল। তারপর বন্দুক দিয়ে ঝোঁপটা দু-ফাঁক ক'রে উঁকি মেরে দেখলে, বাঘটা সত্যসত্যই ম'রে একেবারে আড়ষ্ট হয়ে প'ড়ে আছে, তার সর্ব্বাঙ্গ ভ'রে ভন্ ভন্ করছে মাছির পাল!

কুমার হেঁট হয়ে হাত বাড়িয়ে বাঘটার তলপেট থেকে কি একটা জিনিষ টেনে বার করলে। তারপর সেটাকে বিমলের চোখের সামনে উঁচু ক'রে তুলে ধরলে।

বিমল অবাক হয়ে দেখলে, সেইরকম ছোট্ট কাঠির ডগায় এতটুকু একটা বর্ষার ফলা চক্‌চক্ করছে!

—চার—

বিমল বললে, "সেই ক্ষুদে বর্ষা, আর সেই মারাত্মক বিষ! এ বনে বাঘেরও নিস্তার নেই!"

কুমার বললে, "বর্ষাটা ছিল বাঘের তলপেটে। অমন জায়গায় বর্ষা মারলে কেমন ক'রে?"

বিমল খানিকক্ষণ ভেবে বললে, "দেখ কুমার, ব্যাপারটা বড়ই রহস্যময়। এতটুকু হাল্‌কা বর্ষা দূর থেকে নিশ্চয়ই কেউ ছুড়তে পারে না। তিনজন

মানুষ মরেছে—প্রত্যেকেই চোট্ খেয়েছে হাঁটুর নীচে। বাঘটাও তলপেটে চোট্ খেয়েছে। সুতরাং বলতে হয়, যে এই বর্ষা ছুড়েছে নিশ্চয়ই সে ছিল বাঘের পেটের নীচে। হয়তো বনের এই আজানা বিপদ্ থাকে নীচের দিকেই,—ঝোঁপঝাপে লুকিয়ে।"

কুমার বললে, "কিংবা বাঘটা যখন চিৎ হয়ে শুয়েছিল, বর্ষা মারা হয়েছে তখনই।"

আচম্বিতে বিমলের চোখ প'ড়ে গেল কুমারের শিকারী-বুটের উপরে। সচকিত স্বরে সে ব'লে উঠল, "কুমার, কুমার! তোমার জুতোর দিকে তাকিয়ে দেখ!"

কুমার হেঁট হয়ে সভয়ে দেখলে, তার শিকারী-বুটের উপরে বিঁধে রয়েছে একটা ছোট্ট বর্ষা! আঁৎকে উঠে তখনি সেটাকে টেনে সে ছুড়ে ফেলে দিলে!

বিমল বললে, "ও বর্ষা নিশ্চয়ই তোমার বুটের চামড়া ভেদ করতে পারেনি। কারণ তোমার পায়ের মাংস ভেদ করলে তুমি নিশ্চয়ই টের পেতে!"

—"ওঃ, ভাগ্যে শিকারী-বুট পরেছিলুম! কিন্তু কি আশ্চর্য্য বিমল, এই অদৃশ্য শত্রু কোথায় লুকিয়ে আছে?"

বিমল ও কুমার সাবধানে উপরে-নীচে আশেপাশে চতুর্দ্দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টি নিক্ষেপ করতে লাগল, কিন্তু উঁচু গাছের ডালে একটা ময়ূর, একটা হিমালয়ের পায়রা, গোটাকয়েক শকুনি ছাড়া আর কোন জীবকে সেখানে আবিষ্কার করতে পারলে না। বনের তলায় আলো-আঁধারির মধ্যেও জীবনের কোন লক্ষণ নেই—যদিও কেমন-একটা অস্বাভাবিক রহস্যের ভাব সেখানকার প্রত্যেক আনাচ-কানাচ থেকে যেন অপার্থিব ও অদৃশ্য দৃষ্টি নিক্ষেপ করছে

এবং সুযোগ পেলেই যে-কোন মুহূর্ত্তেই সে যেন ধারণাতীত মূর্ত্তি ধারণ ক'রে বাইরে আত্মপ্রকাশ করতে পারে!

হঠাৎ সাম্‌নের লম্বা ঘাসগুলো সর্-সর্ ক'রে কাঁপতে লাগল, তার ভিতর দিয়ে কি যেন ছুটে যাচ্ছে—ঠিক যেন দ্রুত গতির একটা দীর্ঘ রেখা কেটে!

মাটি থেকে টপ্ ক'রে একটা নুড়ি তুলে নিয়ে কুমার সেই দিকে ছুড়লে, সঙ্গে সঙ্গে ঘাসের কাঁপুনি বন্ধ হয়ে গেল!

"ওটা কি জন্তু দেখতে হবে" ব'লে কুমার যেখানে নুড়ি ছুড়েছিল সেইদিকে দৌড়ে গেল! তারপর পা দিয়ে ঘাস সরিয়ে হেঁট হয়ে দেখেই সবিস্ময়ে চীৎকার ক'রে উঠল!

—"কি কুমার, কি, কি?"

কিন্তু কুমার আর কোন জবাব দিতে পারলে না—সে যেন একেবারেই থ হয়ে গেছে!

বিমল তাড়াতাড়ি তার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। কিন্তু নীচের দিকে তাকিয়ে সেও যেন শিউরে উঠে বললে, "কুমার, কুমার, এও কি সম্ভব?"

—পাঁচ—

মাটির উপরে শুয়ে আছে, অসম্ভব এক নকল মানুষ-মূর্ত্তি!

লম্বায় সে বড়-জোর এক বিঘৎ! কুমারের নুড়ির ঘায়ে অজ্ঞান হয়ে গেছে!

এক বিঘৎ লম্বা বটে, কিন্তু তার ছোট্ট দেহের সবটাই অবিকল মানুষের মত—মাথার চুল, মুখ, চোখ, ভুরু, নাক, চিবুক, কাণ, হাত, পা—মানুষের

যা যা থাকে তার সে-সবই আছে!······তার পাশে হাতের ক্ষুদে মুঠো থেকে খুলে প'ড়ে রয়েছে সেই রকম এক কাঠির বর্ষা!

বিমল ও কুমার নিজেদের চোখকে যেন বিশ্বাস করতে রাজি হ'ল না! বিমল সেই এক-বিঘতী মানুষটিকে দুই আঙুলে তুলে একবার নিজের চোখের কাছে ধরলে—সেই একফোঁটা মানুষের এতটুকু বুক নিঃশ্বাসে-প্রশ্বাসে বার বার উঠছে আর নামছে! বিমল তুলে ধরতেই তার মাথাটা কাঁধের উপরে লুটিয়ে পড়ল! শিউরে উঠে আবার সে তাকে মাটিতে শুইয়ে দিলে!

কুমার হতভম্বের মত বললে, "বিমল, আমি স্বপ্ন দেখছি না তো?"

বিমল বললে, "এও যদি স্বপ্ন হয়, তা'হলে আমরাও স্বপ্ন!"

—"পাহাড় থেকে নেমে এসে তা'হলে এই ভয়ই বনবাসী হয়েছে?"

—"তা ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে? এদের চেহারাই খালি

আমাদের মত নয়, এই পকেট-সংস্করণের মানুষ আমাদেরই মত বর্ষা তৈরি করে, ইস্পাতের ফলা ব্যবহার করতে জানে, আবার বিষ তৈরি ক'রে বর্ষার ফলায় মাখিয়ে বড় বড় শত্রু মারতেও পারে! সুতরাং এর বুদ্ধিও হয়তো মানুষের মত! জানি না, এর দলের আরো কত লোক এখানে লুকিয়ে আছে!........ ঐ যাঃ, কুমার—কুমার—"

ইতিমধ্যে কখন্ যে সেই এক-বিঘতী মানুষের জ্ঞান হয়েছে, তারা কেউ তা টের পায়নি! যখন তাদের হুঁস্ হ'ল তখন সেই পুতুল মানুষ তীরবেগে ঘাস-জমির উপর দিয়ে দৌড় দিয়েছে!

ব্যর্থ আক্রোশে বিমল নিজের বন্দুকটা তুলে নিয়ে কেন যে গুলি ছুড়লে তা সে নিজেই জানে না, তবে এটা ঠিক যে, সেই পুতুল-মানুষকে হত্যা করবার জন্যে নয়!

কিন্তু যেম্নি গুড়ুম্ ক'রে বন্দুকের শব্দ হ'ল, অম্নি তাদের এপাশে ওপাশে, সামনে পিছনে লম্বা লম্বা ঘাসের বন যেন সচমকে জ্যান্তো হয়ে উঠল—ঘাসে ঘাসে এলোমেলো দ্রুত গতির রেখার পর রেখা, যেন শত শত জীব লুকিয়ে লুকিয়ে চারিদিক্ দিয়ে ছুটে পালিয়ে যাচ্ছে!

বিমল ও কুমারও পাগলের মত চতুর্দ্দিকে ছুটাছুটি করতে লাগল, অন্ততঃ আর একটা পুতুল-মানুষকে গ্রেপ্তার করবার জন্যে!

—কিন্তু মিথ্যা চেষ্টা!

তারপরেও বিমল ও কুমার বহুবার বনের ভিতরে খুঁজতে গিয়েছিল। কিন্তু আর কোন পুতুল-মানুষ সে-অঞ্চলে আর দেখা দেয়নি বা বিযাক্ত বর্ষা ছুড়ে আমাদের মত বড় বড় মানুষকে হত্যা করেনি। বোধ হয় বন ছেড়ে তারা আবার পালিয়ে গিয়েছিল ভুটানের পাহাড়-জগতে।
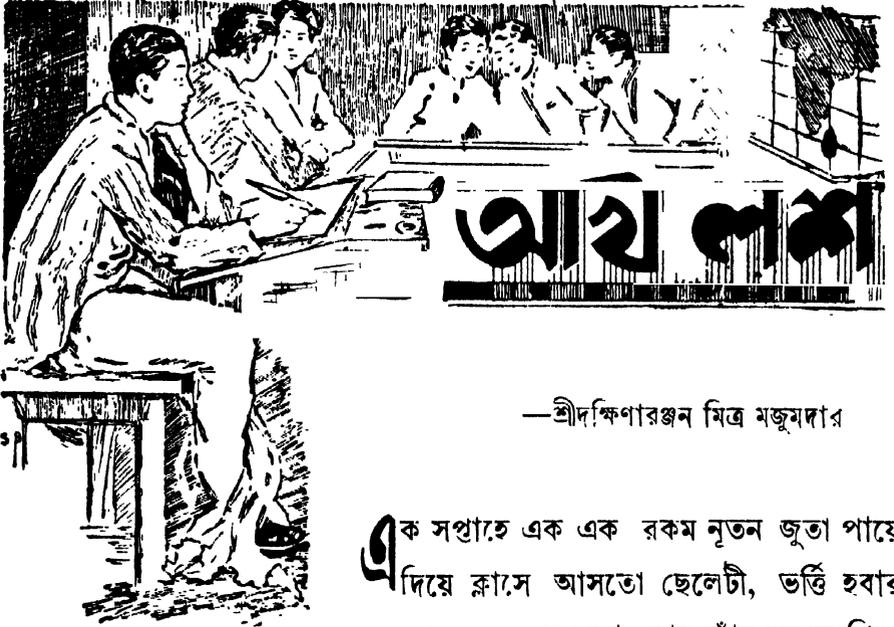
—শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার

এক সপ্তাহে এক এক রকম নূতন জুতা পায়ে দিয়ে ক্লাসে আসতো ছেলেটী, ভর্ত্তি হবার পর থেকে। সে জুতার দাম আঁচ করতে গিয়ে ক্লাস শুদ্ধ ছেলে আমরা, কেঁপে যেতাম। বড়দিনের ছুটীর পর যে জুতা পায়ে দিয়ে ও এলো, শুনলেম, সে জুতার দাম বত্রিশ টাকা! জুতা তো আর রূপা দিয়ে তৈরী হয়নি, ও তো চামড়ার? কি করে তবে বত্রিশ টাকার জুতা হয়, আমরা তা ভেবে উঠতে পারতেম না, আমরা ভাবতেম ও হয়তো একদোম একটা ফাঁকী, নয়তো প্রকাণ্ড ও সব দোকানে জুতার উপর যা খুসি দামের টিকেট লিখে রাখে তাই দিয়েই বড়লোকের ছেলেরা তা কেনে। ঠিক "হস্তিমূর্খ" যাকে বলে, ওরা তাই; শুধু বাহাদুরী করে এসে আমাদের কাছে।

কিন্তু, মাসখানেক পরে আমাদের সঙ্গে ওর বেশ ভাব হ'ল। তখন দেখলেম, অত বড় ধনী লোকের ছেলে হয়েও অখিলেশ, আমাদের মতই মানুষটি! বরং ওর মনটা এত খোলা যে, আমরাই শেষে লজ্জা পেলেম, কেন আমরা ওর বিষয়ে ও রকমটা ভেবেছিলেম।

অখিলেশের বাবা চারটে কয়লার খনির মালিক। এক এক মাসে নাকি তাঁর লক্ষ টাকা আয়! পঞ্চাশ ষাট টাকা জোড়ার কাপড় আর ঐ রকম দামের জামা জুতো ছাড়া অখিলেশের পরবার নাকি উপায় নেই কি কি জন্যে, একদিন টিফিনের ঘণ্টায় অখিলেশ আমাদের এ কথা বললে। বললে যে, মনে হ'ল যেন—প্রায় আধ কাঁদ কাঁদ মুখে। শুধু ও ওর মাকে অনেক ক'রে ধরে আমাদের ইস্কুলে ভর্ত্তি হয়েছে, ওর খুড়তুত ভাই অনিমেশ এই ইস্কুলে পড়ে বলে।

অনিমেশের বাবাও খনির মালিক। তবে অখিলেশের বাবার মত অত বড় লোক নন। তিনি তাঁর তিনটি ছেলেকেই পাড়ার এই ইস্কুলেই পড়তে দিয়েছেন। অখিলেশ তার বাবার এক ছেলে। তাঁর ইচ্ছে নয় যে, অখিলেশ সকলের সঙ্গে এসে বেশী মেশে।

বিদেশী মাষ্টার, দেশী মাষ্টার, চাপরাসী এ সবের ভিড়ে থেকে থেকে অখিলেশ যখন প্রায় শুকিয়ে উঠল, দেখে যে, অনিমেশেরা দিব্যি আর সবার মত ইস্কুলে যায়, খেলে, বেড়ায়, পাড়ার ছেলেদের নিয়ে, এমন কি হা-ডু ডু-ডুও খেলে, তখন আর সে থাকতে পারলে না। অস্থির হ'য়ে সে তার মাষ্টারদের ভিড় পালিয়ে, আমাদের ইস্কুলে এসে ভর্ত্তি হ'ল।

কিন্তু চাপরাসী সে ছাড়তে পারলে না। টুপী পোষাক চাপরাস আঁটা লম্বা দাড়ি একজন তার সঙ্গে আসে আর ইস্কুলের দারোয়ানদের ওখানেই বসে থাকে টিফিন ক্যারিয়ারটা পাশে রেখে।

অখিলেশ এলে আমরা প্রথমটা গিয়েছিলেম চম্‌কেই, এখন আমরা বরং খুব খুসিই হয়েছি।

আমাদের ক্লাসে একটা 'সখাসমিতি' আছে। ক্লাসের ছেলে হ'লেই তাকে তার সদস্য, মানে সভ্য, হ'তে হবে। মাসে চাঁদা এক পয়সা থেকে চার আনা। ক্লাসে যদি কোন ছেলে বই, খাতা, এমন কি জামা কাপড়ও কোন কারণে কিনে উঠতে না পারে, তবে আমাদের 'সখাসমিতি' থেকে যতটুকু পারা যায়, তাকে তার জন্য টাকা নিতে বলা হয়। তা ছাড়া ভাল কোন বইও সমিতি থেকে, সম্ভব হ'লে, কেনা হ'তে পারে।

নিয়ম থাকলেও, আমরা প্রথমটা অখিলেশকে 'সখাসমিতি'র সদস্য ক'রে উঠতে পারিনি। ঠিক কথা বলতে গেলে, সাহস পাইনি। তার সঙ্গে ভাব হ'লে, অর্থাৎ তার ভর্ত্তির দু'মাস পর, আমরা অখিলেশকে সদস্য করতে চাইলেম।

সব শুনে, ভেবে একটু, সে বললে, "কাল হব।"

পরদিন অখিলেশ আমাদের সমিতির সদস্য হ'ল এসে ৫ চাঁদা খাতায় লিখে সই ক'রে।

আমরা তো তা বিশ্বেস করতেই পারছিলেম না প্রথমটা। আমাদের ক্লাসের সব চেয়ে গরীব যে ছেলেটি, সে ছাড়া এক পয়সা চাঁদা বাস্তবিক কারো নেই, যদিও নিয়মে অবশ্য ৫ চাঁদা দিলেও চলতে পারে।

আমরা ভাবলেম, অখিলেশ আমাদের ঠাট্টা ক'রেছে।

কলমটা তুলে তার হাতে আবার গুঁজে দিয়ে আমরা বললেম, "ও হবে না, ভাই, কেটে দিয়ে চার আনাই লেখ।"

চার আনার উপরে নিয়ম নেই, নইলে তাকে আমরা অন্ততঃ এক টাকা লিখতে বলতেম।

অখিলেশ কতক্ষণ চুপ করে থাক্‌ল। শেষে বললে, "ছাখ্ ভাই, আমাদের ক্লাসে আমিই সব চেয়ে গরীব। কলম নে ভাই, আমাকে আর কিছু বলিস নে।"

ওর হঠাৎ এ রকম কথায় আমরা সত্যি ভাই, যেন অপমান বোধ করলেম। চুপ করে গিয়ে, খাতা আমরা বন্ধ করে ফেললেম।

বুঝতে পার্‌লে ও। সমিতির সম্পাদক রমেশ। রমেশের হাতখানি ধরে, ও বললে, "শোন্ ভাই, আমার দুঃখ তোরা বোধ হয় বুঝবিনে। ওই এক পয়সাই আমাকে কি ক'রে দিতে হবে, তাই ভাবছি; তোরা তা জানিস নে। আমার তো টিফিন কিনে খাবার যো নেই যে টিফিন থেকে দেবো। আমি মাকেও কাল কোন কথা বলতে পারিনি। তোরা তোদের ইচ্ছা মত সব করতে পারিস, আমার তা যো নেই। আমায় ভাই তোরা ক্ষমা করিস।"

আমরা অবাক হলেম। রমেশ উল্‌টে তার হাতখানা ধরলে। চেয়ে থেকে বললে, "বলিস কি! তোর ইচ্ছে মত কিছুই তুই করতে পারিস নে? চার আনা চাঁদাও সত্যি দিতে পারিস নে?"

"না, পারিনে ভাই।"

ও একদৃষ্টে যেন একটা বেঞ্চের দিকে চেয়ে রইল।

রমেশ আর কিছু বললে না। তার হাত ছেড়ে দিয়ে বললে শুধু, "ইচ্ছে করলেও কি আর পারিস নে?"

কথাটাতে অখিলেশের কপালটা যেন একটু কুঁচ্‌কে এল।

জানিনে, দুঃখে কি রাগে।

তারপর চোখ দুটো সে নামিয়ে রেখেই, মনে হ'ল যেন, কি একটা বললে সে।

আমার কাছে বোধ হ'ল, যেন, শুনলেম—

"আচ্ছা দেখব।"

—দুই—

তার সতেরো দিন পর, আমাদের ক্লাসের সবচেয়ে গরীব ছেলেটি—পূরো নাম কেন বলব?—নাম তার 'প', তার মামা মারা গেলেন। তার মামাও ছিলেন একা আর যার-পর-নাই গরীব। তবুও তিনি 'প'কে আর তার বোন 'অ'কে ইস্কুলে পড়াচ্ছিলেন। 'প' ক্লাসে খুব যে ভাল ছেলে, তা ছিল না; 'ফ্রি'ও তাই সে পায়নি। 'অ'ও পায়নি। 'অ' আমাদের ইস্কুলের 'গার্লস্ সেক্‌সনে' পড়ে।

পড়া তাদের একেবারে বন্ধ হ'য়ে গেল।

আমরা সমিতির সব সদস্য ভারি চিন্তায় পড়ে গেলাম, কি এর করা যাবে।

আমাদের হিসাবের খাতায় তখন, সব খরচ বাদে ত'বিল দেখা গেল মোটে ১৶১৫।

তিন চার দিনের মধ্যেও আমরা কিছু ঠিক করতে পারলেম না।

আস্‌ছে মাস না এলে তো চাঁদাও আর উঠছে না।

খুবই মুস্কিল হ'ল।

সোমবারে বিকেলে বেড়িয়ে এসে, একটু শুয়েই রইলেম। মনটা ভাল ছিল না। সন্ধ্যার পরে উঠে, বাল্‌বটা খারাপ ছিল, ঠিক ক'রে—জ্বেলে, টেবিলে বসলেন। পড়তেই হবে; কাল হেড্ মাষ্টার মহাশয়ের 'টাস্ক্'।

রাত্রে হঠাৎ রমেশ আমার ঘরে এসে উপস্থিত। বই থেকে মুখ তুলে যেন আন্‌মনার মত জিজ্ঞেস করলেম, "কি রে?"

রমেশ একেবারে সমিতির খাতা এনে ছ'হাতে খুলে ধরে' দেখালে, তাতে ১৫১৮৷৶১৫ জমা। পড়ার টেবিলে বসেই কোন একটা স্বপ্ন দেখছি

কি না, ঠিক বুঝতে না পেরে, প্রায় চেঁচাতে গিয়েছিলেম। শেষে—বলে উঠলেম—"কি রকম ?"

"রকম আর কি ? যা ভাবতে পারিসনি, তাই।"

এই কথা ব'লে একটুখানি হাসিমাখা বড় বড় দুই চোখ তুলে রমেশ আমার দিকে চেয়ে রইল।

আলো পড়ে উজ্জ্বল রমেশের বড় বড় চোখ দুটো দেখছিলেম বটে, কিন্তু কিছু বুঝতে পারলেম না। বললেম, "দুষ্টুমি রেখে, কথাটা বল না।"

"অখিলেশের আজীবন সদস্য হওয়ার চাঁদা।"

ব'লে রমেশ, গম্ভীর হ'য়ে রইল।

"আজীবন সদস্য!"

ব্যাপারটার ভাল রকম কিছুই ধরতে না পেরে, আমি এক রকম হতভম্ব হ'য়ে রইলেম।

"তোদের তো চার আনার বেশী চাঁদা নেবার হুকুম নেই, তাই একটা "আজীবন সদস্য" নিয়মই করতে হ'ল শেষে। নে, সই কর।"

বলতে বলতে রমেশ দেখালে আর এগারো জনের সই সে এনেছে, নিয়মের পাতায়; আরেক জনের অর্থাৎ বারো জনের সই হ'লেই নিয়মটা 'পাকা' হয়।

ভাবলেম, বোধ হয় এটা একটা তামাসা। কিন্তু রমেশ সমিতির খাতা নিয়ে তাই বা করবে কেন? বললেম, "সই না হয় করছি, কিন্তু খুলে বল দেখি?"

বললে রমেশ,—"'প'র আর 'অ'র পড়ার জন্য আর যতদিন যা কিছু তাদের লাগবে, তার জন্য, অখিলেশ এই চাঁদা দিয়েছে আমাদের সমিতিতে, তার সোনার ঘড়ি, হীরের আংটি বেচে, তার মার অনুমতি নিয়ে। হয়তো ওর বাবার কাছ থেকে ও আর আংটি ঘড়ি পাবে না, কিন্তু অখিলেশ বলে দিয়েছে, 'আমিও তো ভাই, তোদের সদস্য, আর কোন কথা তোরা এর উপরে বলতে পারবি নে'।"

আমি আমার হাতের সরু আংটিটার দিকেই চেয়েছিলেম, তাড়াতাড়ি লাল কালির কলম তুলে নিয়ে এক টানে সই করলেম। সই করতে করতে আমার

চোখের কোণে জল জমছিল। জমছিল কেন? তা, এই ভাবতে গিয়ে যে, কাপড় জুতো জামার দাম নিয়ে, তার ভর্ত্তি হওয়ার আটদিন পরে আমরা অখিলেশের ক্লাসে যে সভা করেছিলেম, তার সভাপতি হয়েছিলেম আমি!

সে কথাটা জ্বল্ জ্বল্ করে মনে পড়ল।

সই হয়ে গেলে রমেশকে বললেম, "এই চাঁদা ঘোষণা করতে আস্‌ছে শনিবারে আমাদের যে সভা হবে, তোরা ভাই, আমাকে তার সভাপতি করিস্।"

রমেশ হাসলে। আর বললে, "তা নিশ্চয়।"

আর বললে হেসে, "বল দেখি, আর কি ঘোষণা করা হবে?"—

বুক থেকে ফোয়ারার মতই যেন কথাটা আমার পড়ল ছুটে বেরিয়ে,—

"অখিলেশ" সখাসমিতির 'চিরজীবন **সভাপতি**··।'

ফার্স্ট প্রাইজ

—শ্রীজলধর সেন

কলিকাতা মাণিকতলার খালের ধারে ছোট একখানি খোলার বাড়ীতে বসিয়া মা ও মেয়ে কথা বলিতেছেন। মায়ের বয়স পঞ্চাশ, মেয়েটির বয়স কুড়ি একুশ বৎসর; সে বিধবা। তখন রাত্রি প্রায় আটটা। ঘরের মধ্যে জিনিষ-পত্র নাই বলিলেই হয়। সামান্য কয়েকখানি লেপ তোষক বালিশ; থালা বাসন কিছুই নাই, একটি মাত্র ঘটি ঘরের পার্শ্বে পড়িয়া আছে। দুই তিনটি টিনের বাক্স ঘরের এক কোণে রহিয়াছে; খাট তক্তাপোষ কিছুই ঘরে নাই। ঘরের অবস্থা দেখিলেই বুঝতে পারা যায়, ভীষণ দারিদ্র্য এই গৃহস্থের গৃহ অধিকার করিয়া বসিয়াছে। রমণী দুইটিকে দেখিলে কিন্তু মনে হয়, তাঁহারা চিরদিনই এই অবস্থায় ছিলেন না। তাঁহাদের অবস্থা এককালে ভাল ছিল, ভীষণ দারিদ্র্যের তাড়নায় তাঁহারা এই ক্ষুদ্র জীর্ণ খোলার বাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন।

তাঁহাদের সম্মুখে একখানি ছেঁড়া মাহুরে বসিয়া একটি দশ এগার বৎসর বয়সের ছেলে মিটমিটে প্রদীপের আলোকে পড়িতেছে। ছেলেটি দেখিতে অতি সুন্দর; তাহার মুখের দিকে চাহিলেই তাহাকে ভালবাসিতে ইচ্ছা করে।

মা বলিলেন, "এখন উপায়! যা কিছু ছিল, সকলই ত গেল; আর ত বিক্রীর মত কিছুই নাই। কা'ল সকালেই যে বাড়িওয়ালা ভাড়ার জন্য আস্‌বে। তার ছুইটি টাকা কোথায় পাব? তারপর কা'ল যে ছেলেটির মুখে কি দেব, তা ত ভেবেই পাচ্ছি না, ঘরে যে কিছুই নাই।—হা অদৃষ্ট!"

মেয়ে বলিল, "ভেবে কি হবে মা! অদৃষ্টে যাহা থাকে তাই হবে—এতদিন যা করি নাই, কা'ল থেকে তাই করব; কা'ল থেকে ভিক্ষায় যাব। আর উপায় কি?"

মা বলিলেন, "না নিরু, তা হবে না। এই ঘরে প'ড়ে তিনজনে মরব, তাও স্বীকার, ভিক্ষা করতে পারব না।"

নিরুপমা বলিল, "তা ছাড়া আর কি পথ আছে? পাশের বাড়ীর ওদের বলেছি যে ওদের বাড়ীর পুরুষেরা যদি কোন দোকান থেকে সেলাইয়ের কাজ এনে দেন, তা হ'লে আমরা সেলাই ক'রে দিতে পারি; তাঁরা আমাদের পরিশ্রমের জন্য যা দয়া ক'রে দেবেন, তাই আমরা নেব। ও বাড়ীর বাবু ত বলেছেন, আজ যা হয় একটা ঠিক ক'রে আস্‌বেন। এখনও তাঁর আস্‌বার সময় হয় নাই। তিনি বাড়ী এলেই ও বাড়ীর মেয়েরা খবর দিয়ে যাবেন।"

মাতা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "দেখ।" তাহার পর ছেলেটির দিকে চাহিয়া বলিলেন, "অমর, কা'ল ত তোমাদের প্রাইজ, কা'ল ত আর পড়া হবে না। তবে আর আজ এত রাত্রি পর্য্যন্ত নাই পড়লে। এখন বই তুলে রেখে যে কয়টি ভাত আছে, তাই খেয়ে ঘুমাও।"

অমর মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "মা, কা'ল পড়া হবে না, কিন্তু আমাকে একটা কবিতা মুখস্থ বল্‌তে হবে। সেটা এই কাগজে লিখে এনেছি; সেইটা বেশ ভাল ক'রে মুখস্থ করছি; কি জানি কা'ল অত লোকের মধ্যে যদি হঠাৎ ভুলে যাই, তা হলে আমি ত লজ্জা পাবই, মাষ্টার মহাশয়েরাই বা কি বল্‌বেন। তাঁরা বিনা মাইনেতে পড়াচ্ছেন, দরকার হ'লে দুই একখানা বইও কিনে দিচ্ছেন। তাই সে কবিতাটা বারবার পড়ছি। দিদিকে একবার শুনিয়েছি, তখন একটা কথাও বাধে নি। কেমন দিদি?"

নিরুপমা বলিল, "হাঁ বেশ মুখস্থ হয়েছে, উচ্চারণও ঠিক হয়েছে। যেখানটা যেমন ক'রে বল্‌তে হবে, তাও ঠিক হয়েছে। তবে কা'ল অত লোকের মধ্যে মাথা ঠিক থাক্‌লেই হয়। দেখ অমর, তোমাকে কা'ল যখন আবৃত্তি করবার জন্য ডাকবে, তখন তুমি লোকজন কারো দিকে চেয়ে দেখো না। যেটা তোমাকে বল্‌তে দিয়েছেন, সেটা ঈশ্বরের স্তোত্র কি না। তুমি এক কাজ ক'রো। তুমি নতশিরে হাতযোড় ক'রে বেশ ধীরে ধীরে বল্‌তে আরম্ভ ক'রো, মনে ক'রো, যেন তুমি এই ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে আমাকে কবিতা শোনাচ্ছ। কেমন, তা পারবে?"

অমর বলিল, "দিদি, তুমি যদি সেখানে আমার সম্মুখে ব'সে থাক্‌তে পারতে, তা হ'লে আমার একটুও ভয় হ'ত না। দিদি, তুমি যা বল্‌লে আমি তাই করব, মনে মনে ভাব্‌ব যেন দিদির সম্মুখে পড়ছি।"

মাতা স্নেহপূর্ণ স্বরে বলিলেন, "ভগবান আছেন, তাঁর নাম স্মরণ রাখিও, তোমার পড়া খুব ভাল হবে।"

নিরুপমা বলিল, "অমর, তখন একবার আমাকে শুনিয়েছিলে, মা ত শোনেন

নাই। এখন একবার মাকে শোনাও। যদি কোথাও কিছু ভুল থাকে, তা ঠিক হ'য়ে যাবে।"

তখন অমর দাঁড়াইয়া নতশিরে হাতযোড় করিয়া পরলোকগত রজনীকান্ত গুপ্ত মহাশয়ের রচিত নিম্নলিখিত কবিতাটি আবৃত্তি করিল—

"কে রচিল, এ বিশাল পৃথিবী সুন্দর,—
আকাশের চাঁদ আর নক্ষত্র নিকর ?
কাহার আদেশে রবি লোহিত বরণ,
প্রভাতে উঠিয়া করে আলো বিতরণ ?
শীতল বাতাস আসি কাহার কৃপায়,
ধীরে ধীরে সকলের শরীর জুড়ায় ?
জান কি, রে শিশু ! তুমি কার দয়া বলে,
সুখে বাস করিতেছ, এই ভূমণ্ডলে ?
ঈশ্বর তাঁহার নাম, বড় দয়াময়,
পরম আরাধ্য তিনি, মঙ্গল-আলয়।
তাঁহার কৃপায় আছে বাঁচি জীবগণ,
সকলেরে সদা তিনি করেন পালন।
ভক্তিভরে যোড়করে, মিলি জনে জনে,
প্রণিপাত কর, শিশু ! তাঁহার চরণে।"

এমন সুন্দর ভাবে, এমন প্রাণের আবেগে অমর ঐ কবিতাটি আবৃত্তি করিল যে, শুনিতে শুনিতে মাতার চক্ষে জল আসিল। অমরের কবিতা পাঠ শেষ হইলে মাতা উঠিয়া পুত্রকে কোলে করিয়া বলিলেন, "বাবা, মনে রেখো, ঈশ্বর তাঁহার নাম, বড় দয়াময়।"

নিরুপমা বলিল, "অমর, কা'ল ঠিক যদি এমন ক'রে বল্‌তে পার, তা হ'লে সকলেই ভাল বল্‌বেন। তোমার বেশ মুখস্থ হয়েছে। আজ আর রাত জেগে কাজ নেই। এখন ভাত খেয়ে সকাল সকাল ঘুমাও। কাল সকালে উঠে আবার পাঁচ সাত বার এমন ক'রে পড়ো, তা হ'লেই হবে।"

অমর বলিল, "দিদি, আজ রাত্তিরে আর ভাত খাব না, এই ত স্কুল থেকে এসে মুড়ি খেয়েছি ; তাতেই আমার খাওয়া হয়ে গিয়েছে। ও ভাত কয়টি রেখে দাও, কাল স্কুলে যাওয়ার সময় খেয়ে যাব। মা যে এখনই বল্‌ছিলেন, ঘরে কিছুই নেই, কা'ল কি হবে ! ঐ ভাত কয়টি থাক্‌লেই কা'ল আমার খাওয়া হবে। তারপর তোমরা কা'ল কি খাবে, দিদি ?"

নিরুপমা বলিল, "সে ভাবনা তুমি ভেবো না, অমর ! ভগবান কা'ল যা দেবেন, তাই আমরা খাব। কাল কি হবে তাই ভেবে আজ না খেয়ে থাকবে, তা হবে না। লক্ষ্মী-ভাইটি আমার, ভাত বেড়ে দিই, খাও। কা'লকার ভাবনা কা'ল হবে।"

নিরুপমা আর কথা বলিতে পারিল না ; তাহার মাতা পুত্রের কথা শুনিয়া চক্ষে অঞ্চল দিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। অমর এগার বৎসরের বালক, সে সকল বুঝিতে পারিল। মুখখানি মলিন করিয়া সে একবার মায়ের মুখের দিকে, একবার দিদির মুখের দিকে চাহিতে লাগিল। তাহার পর নিরুপমা তাহাকে জোর করিয়া খাওয়াইয়া দিল।

পরদিন প্রাতঃকালে বাড়িওয়ালা আসিয়া উপস্থিত হইল। নিরুপমা ও তাহার মাতা তাহাকে তাঁহাদের অবস্থার কথা বলিয়া কয়েকদিন অপেক্ষা করিতে বলিলেন। বাড়িওয়ালা প্রথমে ত কোন কথাই শুনিতে চায় না ; শেষে সে যখন দেখিল যে, সে দিন কোন প্রকারেই কিছু পাইবার সম্ভাবনা নাই, তখন

বলিল, সে দুইদিন পরে আসিবে। সে দিন যদি ভাড়ার টাকা না পায়, তাহা হইলে যে জিনিষ-পত্র আছে, সমস্ত আটক করিয়া তাঁহাদিগকে বাড়ী হইতে বাহির করিয়া দিবে। বাড়িওয়ালার এই অপমানজনক কথা শুনিয়া নিরুপমার মাতা নীরবে অশ্রুবিসর্জ্জন করিলেন। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, কোথা হইতে তাঁহারা টাকা পাইবেন? তাঁহাদের এ সংসারে আর কে আছে? যিনি এ পৃথিবীতে একমাত্র আশ্রয় ছিলেন, তাঁহাকে ত ছয়মাস পূর্ব্বে নিমতলার ঘাটে রাখিয়া আসিয়াছেন। বিপদে বিহ্বল হইয়া তিনি ভুলিয়া গেলেন যে, অনাথ-অনাথার আরও একজন আশ্রয় আছেন; তিনি কখনও কাহাকেও ভুলিয়া যান না। এই অসময়ে তাঁহার নাম নিরুপমার মাতার স্মরণ হইল না, তিনি হতাশ হৃদয়ে অশ্রুমোচন করিতে লাগিলেন।

মায়ের এই অবস্থা দেখিয়া বালক অমর বলিল, "মা, তুমি কেঁদ না। তুমিই ত কা'ল আমাকে ব'লে দিয়েছ, 'ঈশ্বর তাঁহার নাম, বড় দয়াময়'। সেই দয়াময়ই আমাদের টাকা দেবেন, আমাদের খেতে দেবেন। তুমি ভাব কেন মা!"

পুত্রের মুখে এই কথা শুনিয়া মাতা যেন হৃদয়ে বল পাইলেন; তাঁহার মনে হইল, কে একজন যেন এই বালকের মুখ দিয়া তাঁহাদের জন্য অভয়বাণী প্রেরণ করিলেন। তিনি তখন পুত্রের মুখচুম্বন করিলেন; কোন কথা বলিবার মত অবস্থা তখন তাঁহার ছিল না।

প্রাতঃকালে উঠিয়াই নিরুপমা পার্শ্বের বাড়ীর গৃহিণীর নিকট হইতে আধ সের চাউল ধার করিয়া আনিয়াছিল। সে তাড়াতাড়ি সেই ভাত চড়াইয়া দিল এবং উঠানের বেগুণ গাছে তিনটি বেগুণ ধরিয়াছিল, তাহারই একটি আনিয়া ভাতে দিল। যথাসময়ে সেই বেগুণভাতে ভাত খাইয়া অমরনাথ প্রাইজ আনিবার জন্য স্কুলে যাইতে প্রস্তুত হইল। সে আজ পঞ্চম শ্রেণীর প্রথম পুরস্কার পাইবে।

তাহার পর তাহার আবৃত্তি। আবৃত্তি যদি খুব ভাল হয়, তাহা হইলে সে আরও একটা পুরস্কার পাইতে পারে। পূর্ব্ব দিনই নিরুপমা ভায়ের কাপড় ও জামাটা আধ পয়সার সাবান আনিয়া কাচিয়া রাখিয়াছিল ; আর ত ভাল কাপড়, কি যেমন তেমন কাপড়ও নাই। এই একখানি কাপড় ও একটা জামা এখন অমরের একমাত্র পরিধেয় হইয়াছে। আর সকলই তাহার মাতা একে একে বেচিয়া ফেলিয়াছেন। কেমন অভাবে পড়িলে যে মাতা প্রাণাধিক পুত্রের বস্ত্র বিক্রয় করিয়া থাকেন, তাহা যে বড় দরিদ্র সেই বুঝিতে পারিবে, অপরকে কেমন করিয়া তাহা বুঝাইব ?

আজ অমর একটু বিলম্বে স্কুলে গেলেও পারিত, কারণ অপরাহ্ণ চারিটার সময় পুরস্কার বিতরণ হইবে ; কিন্তু সে আর বিলম্ব করিতে পারিল না, সাড়ে দশটা বাজিতে না বাজিতেই সে স্কুলে চলিয়া গেল। যাইবার সময় মা ও দিদির পদধূলি লইল। উভয়েই প্রাণের সহিত তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

অপরাহ্ণ চারিটার সময় পুরস্কার বিতরণ আরম্ভ হইল। সহরের অনেক গণ্যমান্য শিক্ষিত লোক এই বিদ্যালয়ের পুরস্কার-সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। হাইকোর্টের একজন দেশীয় বিচারপতি মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন। প্রথমে গান হইল, তাহার পর রিপোর্ট পাঠ হইল। তাহার পর প্রথমে উচ্চশ্রেণীর কয়েকটি ছাত্র ইংরাজী, বাঙ্গালা, সংস্কৃত ও উর্দ্দূ কবিতা আবৃত্তি করিল। সর্ব্বশেষে অমরের ডাক পড়িল। দিদির শিক্ষামত সে ধীরে ধীরে সভাপতি মহাশয়ের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া একপার্শ্বে দাঁড়াইল। তাহার পর নতমুখে করযোড়ে, অমর তাহার কবিতা আবৃত্তি করিল। তাহার মধুর-কণ্ঠ নিঃসৃত সেই শুদ্ধ আবৃত্তি শুনিয়া সভাপতি মহাশয় ও উপস্থিত ভদ্রলোকেরা ধন্য ধন্য করিলেন। অমর সকলকে নমস্কার

করিয়া নিজের আসনে যাইয়া উপবেশন করিল; প্রধান শিক্ষক মহাশয় তাহার পিঠ চাপড়াইয়া বলিলেন, "বেশ অমরনাথ, অতি সুন্দর, অতি সুন্দর আবৃত্তি হইয়াছে।" অমর অবনত মস্তকে এই প্রশংসা গ্রহণ করিল।

তাহার পরই পুরস্কার বিতরণের সময় উপস্থিত হইল। প্রথমে উচ্চশ্রেণীর ছাত্রেরা পুরস্কার পাইল। অমর পঞ্চম শ্রেণীর প্রথম পুরস্কার পাইবে। তাহাকে

যখন ডাকা হইল, তখন সে ধীরে ধীরে যাইয়া সভাপতি মহাশয়কে প্রণাম করিয়া দণ্ডায়মান হইল। সভাপতি মহাশয় তাহার হস্তে পুরস্কারের পুস্তক দিলেন। সে পুরস্কারের পুস্তকগুলি লইয়া পুনরায় প্রণাম করিয়া সভাপতি মহাশয়ের

দিকে চাহিয়া অতি ধীরস্বরে বলিল, "আমি এই বই প্রাইজ চাই না।" এই বলিয়াই সে মস্তক অবনত করিল। সভাপতি মহাশয় ও অন্যান্য ভদ্রলোক বালকের এই কথা শুনিয়া আশ্চর্য্য বোধ করিলেন। সভাপতি মহাশয় স্নেহপূর্ণ স্বরে বলিলেন, "তুমি বই চাও না, তবে কি চাও।" অমর বলিল, "আমরা খেতে পাই না, আমার মা, দিদি খেতে পান না। আমরা যে খোলার ঘরে থাকি, তার ভাড়া দিতে পারি না। আজ সকালে বাড়িওয়ালা এসে ব'লে গিয়েছে, দুই দিন পরে যদি বাড়িভাড়ার টাকা না দিতে পারি, তবে সে আমাদের বাড়ী থেকে বার ক'রে দেবে। আমার এই বইগুলো রেখে আমাকে দুইটি টাকা দিন, তা হ'লে আর বাড়িওয়ালা আমাদের তাড়িয়ে দিতে পারবে না।"

বালকের এই দুঃখের কাহিনী, তাহার এই সরল প্রাণস্পর্শী কথা শুনিয়া উপস্থিত সকলেরই চক্ষু জলভারাক্রান্ত হইল। সভাপতি মহাশয় রুমালে চক্ষু মুছিয়া বলিলেন, "তোমার বাপ ভাই কি কেহই নাই?" এইবার প্রধান শিক্ষক মহাশয় উত্তর করিলেন, "আজ ছয় মাস হইল অমরের পিতার মৃত্যু হইয়াছে; সংসারে উপার্জ্জন করিবার লোক আর কেহই নাই। একদিন অমরের মা আমার বাড়ীতে গিয়া উহাকে ফ্রি করিবার জন্য অনুরোধ করেন, সেই সময় উহাদের দুরবস্থার কথা শুনিয়াছিলাম। উহাকে স্কুলের বেতন দিতে হয় না। বইগুলিও আমরাই সংগ্রহ করিয়া দিই।" এই কথা শুনিয়া সভাপতি মহাশয় বলিলেন, "অমর, বাড়ীতে তোমার কে কে আছেন?" অমর বলিল, "মা আছেন, আর আমার দিদি আছেন। দিদি বিধবা, তাঁহারও কেউ নেই।" সভাপতি মহাশয় বলিলেন, "তোমাদের এতদিন কেমন করিয়া চলিল?" অমর বলিল, "আমাদের যাহা কিছু ছিল, সব বিক্রী হ'য়ে গিয়েছে।

আমার কাপড় জামা পর্য্যন্ত বিক্রী ক'রে চাল ডাল কিন্‌তে হয়েছে। আমার এই একখানি কাপড়, আর এই একটা জামা, আর নেই। আমাদের—"

তাহার কথায় বাধা দিয়া সভাপতি মহাশয় বলিলেন, "অমর, তোমাকে আর কিছু বলিতে হইবে না। তুমি এখন বইগুলি লইয়া তোমার জায়গায় যাও। সভার কাজ শেষ হইলে তোমাকে আবার ডাকিব।" অমর সভাপতি মহাশয়কে প্রণাম করিয়া তাহার আসনে যাইয়া উপবেশ করিল।

অন্যান্য পুরস্কার বিতরণ হইয়া গেলে যখন আবৃত্তির পুরস্কার বিতরণের সময় আসিল, তখন অমরনাথ সর্ব্বোচ্চ পুরস্কার লইবার জন্য দণ্ডায়মান হইল। অমরনাথ সভাপতি মহাশয়ের নিকট উপস্থিত হইলে সভাপতি মহাশয় স্কুলের নির্দ্দিষ্ট পুরস্কার একখানি বড় পুস্তক তাহার হস্তে দিলেন এবং তাহার পর পকেট হইতে ১০৲ টাকার পাঁচখানি নোট বাহির করিয়া বলিলেন, "অমরনাথ, তোমার আবৃত্তির পুরস্কার আমি এই ৫০টি টাকা দিলাম। আর মাসে মাসে তোমাদের খরচের জন্য তোমার এই হেড-মাষ্টার বাবুর হাতে আমি কুড়িটি করিয়া টাকা দিব; তিনি তোমাদের দিবেন।" তাহার পর হেড-মাষ্টার মহাশয়কে বলিলেন, "আপনি এই ছেলেটির ও ইহার মা বোনের তত্ত্বাবধান করিবেন। ঐ কুড়ি টাকা বাদে ইহাদের যখন যা' দরকার হবে, আমাকে বল্‌বেন, আমি তা আপনার হাতে দেব। আর অমরকে নিয়ে আপনি মাঝে মাঝে আমার ওখানে যাবেন।" সকলে ধন্য ধন্য করিয়া উঠিল। সভাপতি মহাশয় যখন অমরের হাতে পাঁচখানি নোট দিতে গেলেন, তখন অমর বলিল, "এত টাকা! আমাদের এত টাকা দিলেন কেন?" সভাপতি মহাশয় বলিলেন, "এ তোমার আবৃত্তির পুরস্কার।" হেড-মাষ্টার মহাশয়ের আদেশ অনুসারে অমর হাত পাতিয়া নোট পাঁচখানি লইল।

পুরস্কার বিতরণ শেষ হইয়া গেলে হেড-মাষ্টার মহাশয় অমরকে সঙ্গে লইয়া

তাহাদের বাড়ীতে গেলেন। অমর মায়ের হাতে পঞ্চাশ টাকার পাঁচখানি নোট দিয়া বলিল, "মা এই দেখ, দয়াময় টাকা দিয়াছেন। দিদি, হেড-মাষ্টার মহাশয় বাহিরে দাঁড়িয়ে আছেন। তোমাদের কি বলবেন।" নিরুপমা বলিল, "যাও অমর, তাঁকে ভিতরে নিয়ে এস।"

অমর মাষ্টার মহাশয়কে ডাকিয়া আনিতে গেল, নিরুপমা তাড়াতাড়ি ছেঁড়া মাদুরখানি সেই কুটীরের বারান্দায় পাতিয়া দিল। হেড-মাষ্টার মহাশয় উঠানে আসিলে অমর তাঁহাকে বসিতে বলিল। তিনি বসিলেন না, দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সে দিনের সমস্ত কথা বলিলেন। হেড-মাষ্টার বাবুর কথা শুনিয়া নিরুপমা অবগুণ্ঠনাবৃতা হইয়া বাহির হইয়া আসিয়া মাষ্টার মহাশয়ের চরণে প্রণাম করিয়া অতি ধীর স্বরে বলিল, "আমরা বড় কষ্টে পড়িয়াছিলাম, আপনাদের দয়ায় আমরা প্রাণ পাইলাম। এখন আমার ভাই যাহাতে মানুষ হয়, দয়া করিয়া তাই করিবেন।" মাষ্টার মহাশয় চলিয়া গেলেন। অমর তখন তাহার দিদিকে বলিল, "দেখ দিদি, আমি মুখস্থ বলবার সময় দেখলাম, তুমি আমার সুমুখে হাসিমুখে দাঁড়াইয়া আছ! তখন আর আমার ভয় রইল না। তখন তুমি যেমন বলে দিয়েছিলে, ঠিক তোমার দিকে চেয়ে তেমন ক'রে কবিতা বলেছিলাম। তাই আমি ফার্ষ্ট প্রাইজ পেয়েছি।" নিরুপমা ভাইটিকে কোলের মধ্যে জড়াইয়া ধরিল।

—শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়

দক্ষিণপাড়ার সঙ্গে মুন্সীপাড়ার ছেলেদের কপাটীর ম্যাচ্ ছিল। মুন্সীপাড়া দলের ক্যাপ্টেন হইল—হীরালাল। সমস্ত দিন তাহার আর কাজের অন্ত ছিল না। যদিও সে খেলায় নামে নাই বটে, কিন্তু তাহার কাজ কত! নদীর ধারের মাঠটি পরিষ্কার করা; কাগজের নিশান তৈরী করা; হাফ-টাইমের টিফিনের জন্য প্রত্যেকের চারিখানি করিয়া বিস্কুট ও দুইটা করিয়া নারিকেল-সন্দেশ যোগাড় করা; খেলার আরম্ভে, হাফ-টাইমে ও শেষে ঢোল বাজাইবার জন্য নন্দ ঢুলিকে ঠিক করা; এক আউন্স টিঞ্চার আইডিন ও কিছু ন্যাকড়া যোগাড় করিয়া রাখা প্রভৃতি কার্য্য ত হিসাবের মধ্যে ছিল; কিন্তু হিসাবের বাহিরে এ সম্বন্ধে ছোট-খাট কাজ এত ছিল যে তাহা

আর বলিবার নয়। সুতরাং সারাদিনের পর বাড়ী ফিরিতে সেদিন তাহার সন্ধ্যা উৎরাইয়া গেল। সন্ধ্যার পরিবর্ত্তে ফিরিতে তাহার হয়ত রাত দশটাই হইত। তাহা যে হয় নাই, তাহার কারণ ম্যাচে তাহাদেরই হার হয়। হার না হইয়া জিত্ হইলে, উল্লাসে এবং উৎসাহে দলবলসহ সারা গ্রামখানা আনন্দ-কলরবে মুখরিত করিয়া ঘুরিয়া আসিতে ঠিকই রাত দশটা বাজিয়া যাইত।

কিন্তু সারাদিনের পর এই সন্ধ্যার পর ফিরিয়া আসার জন্য পিতার নিকট হইতে যে ধাক্কা আসিল, তাহাতেই তাহাকে বিব্রত হইয়া পড়িতে হইল। পিতা হরিলাল বাবু যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করিয়া সেই রাত্রেই কলিকাতায় হীরালালের মামাকে পত্র লিখিতে বসিলেন। লিখিলেন—"এখানে কু-সঙ্গীদের সঙ্গে মিশে হীরালাল খারাপ হোয়ে যাচ্ছে। আমার ইচ্ছা, তোমার কাছে ও কোলকাতায় থেকে পড়াশুনা করে। সুতরাং শীগ্‌গীর একদিন এসে ওকে এখান থেকে নিয়ে যাবে।"

কলিকাতা হইতে হীরালালের মামা উত্তর দিলেন—'১৭ই শ্রাবণ মঙ্গলবার অষ্টমীর দিন খুব ভাল দিন, ঐ দিন হীরুকে লইয়া আসিব।'

হীরালালের মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। কামারপুর ছাড়িয়া সে কি করিয়া কলিকাতায় গিয়া থাকিবে? যতীন, গোষ্ঠ, হাঁদু, নগেন, নেড়া—ইহাদের ছাড়িয়া সে কি করিয়া চলিয়া যাইবে?

আকাশ আর একজনেরও মাথায় ভাঙ্গিয়া পড়িল। সে—হীরালালের জননী। হরিবাবুকে তিনি অনেক রকম বুঝাইয়া বলিলেন, যাহাতে হীরুকে কলিকাতায় পাঠানো না হয়। কিন্তু হরিবাবু স্ত্রীর কথায় কর্ণপাত করিলেন না। হীরুর মা কোন রকমেই স্বামীর মত পরিবর্ত্তন করিতে না পারিয়া শেষকালে ও-বাড়ীর ন-গিন্নীকে গোপনে উকিল নিযুক্ত করিলেন। ন-গিন্নী হরিলালকে

বুঝাইল, হ্যাঁরে হরি, শুনলুম হীরেটাকে নাকি কোলকাতা পাঠাচ্ছিস্। এ তোর কি রকম বুদ্ধি হোলো রে! ঐ একরত্তি ছেলে, ও কি কখনো মামা-মামীর কাছে থাক্‌তে পারে?

হরিলাল কহিল, একরত্তি কি বলছো দিদি! তের-চোদ্দ বছর বয়স হোল! গাঁয়ে থেকে এই রকম বদ্ সঙ্গীদের সঙ্গে দিনরাত খেলা করে বেড়ালে—

কথাটা সবটা বলিতে না দিয়া ন-গিন্নি কহিল, তের-চোদ্দ বছর বয়েস আবার বয়েস! আর ও-বয়েসে তুই-ই বা কি করেছিলি? সে-সব কথা ত আমাদের মনে আছে সব! গিরীশ পণ্ডিতের পাঠশালাটা জ্বালিয়ে তুলেছিলি! আমাদের খিড়কীর বাগানে তোর উৎপাতে কি আর কোন ফল-পাকড় পাকতে পেত! বোশেখ-জোষ্টি মাসে অত বড় নায়েব-দীঘির জলটাকে সারাদিন তোরা ঝাঁপাই ঝুড়ে যেন গঙ্গাজল করে তুলতিস্। সারাদিন ঘরে কি কেউ তোর মাথার টিকি দেখ তে পেত? কিন্তু যেই একটু বয়স হোল, সব বদলে গেল। যে-হরি বই ছুঁতো না, সেই হরি সোনার হরি হোয়ে গেল! সারা গাঁটাকে—কিন্তু আর ন-গিন্নীর বলিবার দরকার হইল না। 'সোনার হরি' কথাটাতেই কাজ হইল। নিজের বিষয়ে এই প্রশংসার বাণীতে, হরিলালের মুখখানা আনন্দে ও গর্ব্বে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। হীরালালের প্রতি তাহার কঠোর 'রায়' একটু নরম হইল। হরিলাল স্ত্রীকে কহিল, দেখ, হীরেকে কোলকাতা পাঠানো না-পাঠানো 'টসিং'-য়েতে ঠিক হবে।

হীরুর মা কহিল, টসিং-ফসিং আমি বুঝি না; সে আবার কি?

হরিলাল একটা পয়সা দেখাইয়া কহিল, এই পয়সাটা ওপরদিকে ছুড়ে দেওয়া হবে। যদি রাজার মুখের দিক্‌টা চীৎ হোয়ে মাটিতে পড়ে, তা'হোলে ওকে কোলকাতায় পাঠানো হ'বে; আর যদি উল্‌টো পিঠটা ওপরদিকে থাকে, তা' হোলে ও এখানেই থাক্‌বে। পয়সাটা হীরেই ফেলুক।

যাহাতে রাজার মুখ চীৎ হোয়ে না পড়ে এই প্রার্থনা ভগবানকে জানাইয়া হীরালাল কতক আশায় কতক নিরাশায় পয়সাটা লইয়া উর্দ্ধে ছুড়িয়া দিল। কিন্তু হায় হায়! পয়সাটা যেন বিশ-মণি পাথর হইয়া তাহার বুকের উপর চাপিয়া পড়িল। মাটির উপর রাজার মুখটা চীৎ হইয়া পড়িয়া জ্বল্ জ্বল্ করিতে লাগিল। হীরালালের অন্তরটা যে পরিমাণ দমিয়া গেল, সেই পরিমাণে রাজা সপ্তম এড্-ওয়ার্ডের মুকুটহীন মাথাটার প্রতি তাহার বিষম রাগ হইল। তাহার মা কহিল, এবারটা ছেড়ে দাও, আর একবার ফেলা হোক। এইবার যা' পড়বে, তাই হবে।

হরিলাল কহিল, তা' হয় না। ওকে যেতেই হবে।

সুতরাং মাতুল আসিলে, ১৭ই শ্রাবণ মঙ্গলবার শুভদিনে শুভক্ষণে তাঁহার সহিত হীরালালকে কলিকাতা যাত্রা করিতে হইল।

* * *

অধিকাংশের কাছে যে কলিকাতা স্বর্গ বলিয়া মনে হয়, হীরালালের কাছে তাহা নরক বলিয়া মনে হইল। না আছে হাওয়া, না আছে ফাঁকা মাঠ, না আছে গাছ-পালা, পাখী, পুকুর, আর না আছে তাহার সেই সব চব্বিশ ঘণ্টার সঙ্গী-সাথী! কলিকাতা যেন হীরালালের পক্ষে বন্দীনিবাস হইয়া পড়িল। পিচ বাঁধানো পথ, ইলেক্‌ট্রিকের আলো, এত হরেক রকমের গাড়ী-ঘোড়া, এত লোকজন, এত হট্টগোল, এত অপরিচয়—এ সব তাহার মোটেই ভাল লাগিল না।

সে শ্যামবাজারের বি, এম, ইনষ্টিটিউশনে ভর্ত্তি হইয়াছিল, কিন্তু তাহার সহ-পাঠীদের চাল-চলনের সহিত নিজের চাল-চলন কিছুতেই খাপ খাওয়াইতে পারে নাই। তাহারা টবের গাছের মত সীমাবদ্ধ কাজকর্ম্মের মধ্যে চলাফেরা করে, আর উদার অনন্ত আকাশতলের সীমাহীন প্রান্তরে তাহার কর্ম্মস্থল। তাহারা

খাঁচার পাখী, সে মুক্ত বিহঙ্গম। সুতরাং ঘরে-বাহিরে, বাড়ীতে, স্কুলে, পথে, ঘাটে কোন স্থানেই সে আর আনন্দ পায় না। তাহার তের বছরের জীবনের আনন্দ-স্রোতে হঠাৎ যেন নিরানন্দের ভাঁটা দেখা দিল। কেবলই তাহার কামারপুরের কথাই মনে পড়ে—সেই চাল্‌তা-ভাঙ্গা' বোসেদের নতুন বাগান, আট-চড়ক তলা, সিদ্ধেশ্বরীর মন্দির, ভুঁইপাড়ার মাঠ ! নায়েব-দীঘিতে সাঁতার কাটা, 'সুদো'র জলায় বাঁধের উপর বসিয়া পুঁটুলে ছিপে মাছ ধরা, টিফিনের ছুটিতে স্কুল পালানো। সেখানকার সেই রাজ-লুকোচুরী খেলা, কপাটীর-ম্যাচ্, বৌবস্তি, মনসার গান, সাঁওতালপাড়ার মুরগীর লড়াই, বাগ্দীপাড়ার হরি সঙ্কীর্ত্তন। কত কি—কত কি ! তাহার মন অতৃপ্তির চঞ্চলতায় ছট্-ফট্ করিতে লাগিল। এই সময় কলিকাতার পথে পথে, পার্কে পার্কে শোভাযাত্রা, সভা-সমিতি ও বক্তৃতার ধুম লাগিয়া গিয়াছিল। আন্দামানে ১৭৯ জন রাজবন্দী অনশন সুরু করিবার ফলে এই ব্যাপারটা ঘটিয়াছিল। হীরালাল ভাবিল, সে-ও ত একজন বন্দী। কলিকাতার এই মামার বাড়ীই তাহার আন্দামান। তাহাব কি এখান হইতে—এই নির্ম্মম, নিদারুণ আন্দামান হইতে মুক্তি নাই ? বাবার উপর তাহার খুবই রাগ হইল। তাঁহার কি এতটুকু মায়ামমতা নাই ? তাঁহার প্রাণ কি পাষাণের চেয়েও কঠিন ? সে ঠিক করিল, সে-ও অনশন আরম্ভ করিবে।

কিন্তু বিনা কারণে অনশন করা তাহার খাটিবে না। বলিতে হইবে—কলিকাতা তাহার সহ্য হইতেছে না। তাহার শরীর খারাপ হইয়াছে ; অসুখ করিয়াছে ; জ্বর হইয়াছে। জ্বরটা কি করিয়া হয় ? পূর্ব্বে কাহারো কাছে সে শুনিয়াছিল যে, একটা পেঁয়াজ বগলে খানিকক্ষণ চাপিয়া রাখিলে নাকি জ্বর হয়। সে তখনি একটা পেঁয়াজ যোগাড় করিয়া, তাহা বগলের মধ্যে চাপিয়া রাখিয়া শুইয়া রহিল। কিন্তু বহুক্ষণ অতিবাহিত হইয়া গেলেও তাহার দেহে জ্বরের কোন লক্ষণই

প্রকাশ পাইল না। তখন সে হতাশ হইয়া জানালার ফাঁকে পেঁয়াজটা দূর করিয়া ফেলিয়া দিল।

সেইদিন সন্ধ্যায় হীরালালের মামা আফিস হইতে বাড়ী আসিয়া বিষণ্ণ মুখে হীরালালের মামীকে কহিলেন, পকেট থেকে মনি-ব্যাগটা আজ হারিয়েছি।

চোখ কপালে তুলিয়া মামী কহিলেন, সে কি গো!

আর সে কি গো। লোকসানের বরাত পড়েচে বুঝতে পারচি। সে-দিন নতুন কাপড়খানা বেড়ালে আঁচড়ে ফালা-ফালা করে দিলে। পরশু দশ টাকার নোট ভাঙ্গিয়ে কোত্থেকে একটা ডাহা সীসের টাকা ঘরে আন্‌লুম। বলিয়া ফিস্‌-ফিস্‌ করিয়া অনুচ্চস্বরে যাহা বলিলেন, তাহা যাহাকে লুকাইয়া বলা তাঁহার অভিপ্রায়, সে কিন্তু শুনিতে পাইল। অর্থাৎ হীরালাল ঘরের দ্বারদেশে অন্ধকারের মধ্যে নিঃশব্দে তখন দাঁড়াইয়া ছিল।

ফিস্‌-ফিস্‌ করিয়া মামা বলিয়াছিলেন, হীরেটা দেখ্‌চি ভয়ানক অপয়া। ও আসা অবধি এক পয়সাও আর আফিসে উপ্‌রি উপায় নেই; তার ওপর এইসব লোকসান!

হীরালালের মামাটি একটু মেয়েলী স্বভাবের লোক—মেয়েদের মত 'পয়' 'অপয়'টা খুব মানেন। তিনি এ যুগের লোক হইলেও সে-যুগের লোকের মত এই স্বভাবটি তাঁহার চিরকালই আছে।

কিন্তু তাঁহার কি আছে, কি নাই—তাহা লইয়া মাথা ঘামাইবার আমাদের প্রয়োজন নাই। হীরালালেরও নাই। কিন্তু তথাপি ইহা লইয়া হীরালাল তাহার ছোট মাথাটাকে একটু ঘামাইতে প্রবৃত্ত হইল এবং ইহার ফলে সে উৎসাহ-উৎফুল্ল অন্তরে, মনে মনে বলিল, মুক্তি—মুক্তি—মুক্তি পেতেই হবে। পরদিন হইতে সে সকাল-বিকাল কিছু-একটার সন্ধানে পথে পথে ঘুরিতে লাগিল।

দিন আষ্টেক পরে একদিন সকালে, গেরুয়ার আলখেল্লা ও পাগড়ী-পরা এক পাঞ্জাবী 'ফরচুন টেলার' একছড়া জমকালো স্ফটিকের মালা গলায় পরিয়া এবং এক হাতে তুই একখানি বহিপত্র ও অপর হাতে একগাছি লাঠি লইয়া দর্শন দিলেন। সদরের দরজা ঠেলিয়া ভিতরে ঢুকিয়াই সে—'নোটোব্বার বাবু—স্যার—কোথায় আপনি ?'
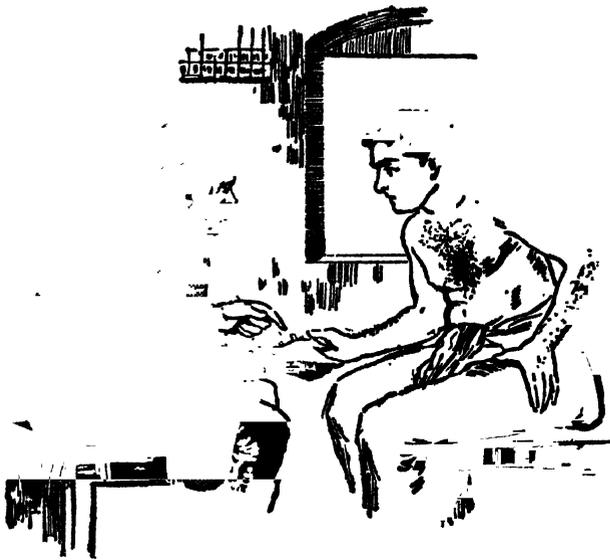
নটবর বাবু অর্থাৎ মামা অপরিচিতের মুখে নিজের নাম শুনিয়া চমকিত হইলেন। তিনি কি বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু তৎপূর্বেই আগন্তুক একটু তুঃখিতভাবে কহিল, মনিব্যাগ হারিয়েছে, কোন আফ্‌শোষ করবেন না। ব্যাড্ ফরচুন! আফিস্‌মেভি তো বহুৎ রোজগার কম্‌তি হো গিয়েছে !

মামা 'থ' হইয়া গেলেন। ফরচুন টেলার জাঁকিয়া বসিল। মামাও শ্রদ্ধাভরে ফরচুন টেলারের জমকালো পাগড়ীটি দেখিতে দেখিতে বসিয়া পড়িলেন।

ফরচুন টেলার মামার হাতখানা লইয়া গভীর মনোযোগের সহিত দেখিতে লাগিল। দেখিয়া কহিল, 'বৃহস্পাত্' আউর 'রাহু' একজোট্ হো গিয়েছে। রাহুকে যদি নেই ভাগাতে পারবেন নোটোব্বার বাবু ত বড়ই খারাপী হবে !

উপরের কথাগুলি বলিবার সঙ্গে সঙ্গেই মেঝের উপর খড়ি দিয়া একটা ঘর কাটিয়া কি হিসাব করিল। তারপর কহিল, কোই লেড়কাকে কি বাহারসে এনেছেন আপনি ?

মামা অধিকতর আশ্চর্য্য হইয়া ঘাড় নাড়িয়া জানাইলেন,—হ্যাঁ।

ফরচুন টেলার কহিল, পাঁচঠো সুপারি আউর একঠো রোপেয়া হামায় দিন তো। কিছু ঘাব্ড়াবেন না, রাহু ছোড়ে যাবে।

মামা পাঁচটা সুপারি ও একটা টাকা আনিয়া দিলেন। তারপর খানিকক্ষণ হিসাব এবং বিচারের ফলে, ফরচুন টেলার কহিল, হীরুলাল—হীরুলাল—হ্যাঁ—হীরুলাল। লেড়কাকো হীরুলালই নাম আছে। য্যায়সে কংসারি—উসিমাফিক নোটোব্বরারি। লেড়কা ভালা—তোমারা আস্তে খারাপী।

মামা এই সব শুনিতে শুনিতে তদ্গতচিত্ত এবং তাঁহার প্রদত্ত সুপারি ও টাকাটি 'ফরচুন টেলারে'র পকেটস্থ। যাইবার কালে সে মামার হাতে একটা সাদা দাগবিশিষ্ট কাল নুড়ি-পাথর দিয়ে কহিল, যতন্সে রেখে দেবেন, মঙ্গল হোবে ; একঠো রোপেয়া আউর দিয়ে দিন—ইস্‌কে লিয়ে।

ইহার খানিকপরেই নিকটস্থ পার্কের একটা বেঞ্চের উপর উপবিষ্ট হীরালালকে 'ফরচুন টেলার' বলিতেছিল, আর একঠো রোপেয়া দিয়ে দাও খোকাবাবু। তোমারা লিয়ে বহুৎ মেহান্নত্—

বাধা দিয়া হীরালাল বলিয়া উঠিল, আরে পাঞ্জাবীজী, আর আমার নেই বাবা। তোমাকে দেবার জন্যে, যা কখনো করিনি তাই করিচি, অর্থাৎ মামীর বাক্সটা খোলা পেয়ে, তাই থেকে একটা টাকা—

দুইজনেই মৃদু হাসিল। তবে দুইজনের হাসি দুই প্রকারের।

ওদিকে দ্বিতলের শয়নঘরে মামা-মামীতে নিম্নোক্তরূপ কথাবার্ত্তা চলিতেছিল

মামী কহিলেন, তুমি নাও নি ?

আমি তোমার বাক্সে কখনো হাত দি ?

তা'হোলে একটা টাকা গেল কোথা ? পাঁচটা টাকা আমার গুণে রাখা। হীরে ত এ-ঘরে কখনো ঢোকে না যে বলব—সে নিয়েছে। আর সে সে-রকম ছেলেও নয়। একটা আধলার দরকার হোলেও সে চেয়ে নেয় ; না বলে নেয় না।

মামা একটু যেন বিরক্ত হইয়া কহিলেন, আরে নেয় কি আর সাধে ! রাহু নেওয়ায়। যা' বলেছিলুম, অক্ষরে অক্ষরে আজ মিল্‌লো ত ? ওকে আর এক-দণ্ডও এখানে আমি রাখচি না। আজ আর আমি আফিস যাব না। আফিস কামাই করেও ওকে আমি আজ কামারপুরে দিয়ে আসবো।

অতএব যে মিথ্যা একটা অজুহাত দেখাইয়া হীরালালকে আবার কামারপুরে রাখিয়া আসিতে হইবে,সেই বিষয়ে যখন উভয়ে পরামর্শরত সেই সময় হীরালাল বাহির হইতে বাটী ঢুকিয়া নীচে মামীমাকে দেখিতে পাইয়া উচ্চকণ্ঠে ডাকিল,—মামী মা !

* * *

আবার কামারপুর। সেই নদীর ধারের মাঠ। সেই কপাটীর ম্যাচের আয়োজন। তবে এবার মুন্সীপাড়ার সঙ্গে দক্ষিণপাড়ার খেলা নয়। আজিকার খেলা, মুন্সীপাড়ার সঙ্গে পাশের কাজল-দীঘি গাঁয়ের ছেলেদের।

আজিকার খেলায় এ-দলের ক্যাপ্‌টেন হীরাহাল অনুপস্থিত—সে কলিকাতায় তাহার মামার বাড়ী। তাই আজ মুন্সীপাড়ার ছেলেদের মধ্যে উৎসাহের একান্তই অভাব। সেদিন দক্ষিণপাড়ার সঙ্গে খেলায় তাহাদের হার হইয়াছিল সত্য, কিন্তু উৎসাহের অভাব ছিল না। তাহারা পরিপূর্ণ উৎসাহের সহিত খেলিয়াছিল। তাই আজ সকলেই মনে মনে ভাবিতেছে,—আজ যদি হীরালাল থাকিত !

তখনো খেলা আরম্ভ হইবার আধঘণ্টা সময় বাকী ছিল। কাজলদীঘির দল তাহাদের সঙ্গে ও গাঁয়ের একজন ঢুলীকে আনিয়াছিল। সে ঢোলের শব্দে সমস্ত নদীর ধারটাকে প্রকম্পিত করিয়া তুলিতেছিল। ও-গাঁয়ের অনেক ছেলেই খেলা দেখিতে আসিয়াছিল। তাহাদের সকলেরই বিশ্বাস, কাজলদীঘি আজ জিতিবে।

হঠাৎ মুন্সীপাড়ার দলের মধ্যে একটা আনন্দ-কোলাহল এবং হৈ-চৈ লাগিয়া গেল। হীরালাল আসিয়াছে।

হীরালালকে ঘিরিয়া সকলের সে কী আনন্দ!

গোষ্ঠ বলিল, তোর বাবা তোকে আবার হঠাৎ আনলেন যে বড়ো?

হীরালাল কহিল, বাবা আনেন নি, মামা দিয়ে গেলেন।

হঠাৎ দিয়ে গেলেন যে?

নেহাৎ হঠাৎ নয় রে ভাই! আন্দামানের বন্দীর মত কি ভাবে যে আমার দুঃখের দিন কাটছিলো তা' আর কি বলবো। উপায় ভেবে ভেবে মাথা ঘুলিয়ে গেছলো। শেষকালে ঘোলা মাথায় সাংঘাতিক উপায় বার ক'রে ফেললুম।

নেড়া পরম আগ্রহের সহিত তাহার মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি করলি?

খেলা আরম্ভের ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল।

হীরালাল বলিল, সব বলবো এখন। মোটের ওপর—এই বন্দীর মুক্তির প্রধান উপায়, একজন ফরচুন টেলার।

যতীন সবিস্ময়ে চোখ কপালে তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ফরচুন টেলার?

হ্যাঁ। একজন পাঞ্জাবী ফরচুন টেলার।

সেদিনকার খেলায় মুন্সীপাড়ারই জিত হইল।

—শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

তারিণীকে চেনো না?

শীতের দিনে গরম কাপড়ে আপাদ-মস্তক ঢাকা দিয়ে চোখ দু'টি মাত্র বের করে' যে-লোকটি পথ চলে—তারই নাম তারিণী মুখুজ্যে।

মরণকে তার বড় ভয়।

বলে, 'কলকাতার রাস্তায় জীবনটিকে হাতে নিয়ে পথ চলতে হয়। গাড়ী, ঘোড়া, ট্রাম, বাস্—একবার একটুখানি বেসামাল্ হ'য়েছ কি—বাস্, খতম্!'

বলে, 'ছাখো, রাস্তায় যখন বেরুবে, একটা কাগজের টুক্‌রোয় নিজের নাম আর ঠিকানা লিখে পকেটে রেখে দিও। মরে গেলে অন্ততঃ খবরটা পাওয়া যাবে।'

এম্‌নি অদ্ভুত তার কথাবার্ত্তা বলবার ধরণ!

যাই হোক্, তারিণীর গল্প শোন্‌বার আগে তার পরিচয়টা একটুখানি জানা প্রয়োজন।

তারিণী মুখুজ্যে, জাতিতে ব্রাহ্মণ সেকথা না বললেও চলে। বাড়ী বর্দ্ধমান জেলায়। বাস্, এই পর্য্যন্তই।

কোন্ গ্রামে বাড়ী, বাড়ীতে কে আছে না আছে তারিণী কাউকে কোনো দিন সেকথা জানায়নি।

দেশ থেকে তারিণী কলকাতায় এসেছিল সম্ভবতঃ চাকরির সন্ধানে। কিন্তু তারিণীর মত লোকের চাকরি হওয়া একটু শক্ত। কি চাকরি সে করবে? একে লেখাপড়া ভাল জানে না, তার ওপর তার নানারকমের সুবিধা-অসুবিধা আছে।

কোথাও কিছু জোগাড় করতে না পেরে তারিণী একদিন কপাল ঠুকে মজিল-পুরের বাবুদের বাড়ীতে এসে ঢুকলো। মেজবাবু আর সেজবাবু দু'জনেই তখন সপরিবারে কলকাতার বাড়ীতে রয়েছেন। সকাল বেলা। শীতকাল। মেজবাবু বাইরের ঘরে বসে বসে চা খাচ্ছিলেন। তারিণী এসে ঘরে ঢুকলো। মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত র‍্যাপার মুড়ি দেওয়া, চোখ দু'টি শুধু বেরিয়ে আছে!

মেজবাবু বললেন, 'কি চাই?'

তক্তাপোষের একধারে তারিণী চেপে বসলো।

মুখের ঢাকাটা একটুখানি খুলতেই দেখা গেল, ভদ্রলোকের মত মুখের চেহারা!

মেজবাবু আবার জিজ্ঞাসা করলেন, 'কাকে চাই?'

তারিণী বললে, 'আজ্ঞে না, কাউকে চাই না। দেশ থেকে এসেছিলাম একটা কাজ-কর্ম্মের সন্ধানে, কিন্তু যে শীত!'

মেজবাবু রসিক লোক। বললেন, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, এখানে ভয়ানক শীত। আপনি দেশেই ফিরে যান।'

তারিণী ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে' মেজবাবুর মুখের পানে তাকিয়ে রইলো।

মেজবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, 'চা খাবেন?'

তারিণী বল্‌লে, 'তা'—এই ঠাণ্ডায়—চা এক বাটি—'

আর কিছু বলবার দরকার হ'লো না। মেজবাবু ডাকলেন, 'ভোলা!'

ভোলা-চাকর এসে দাঁড়ালো।

মেজবাবু বললেন, 'এক পেয়ালা চা দিয়ে যা।'

ভোলা চলে যাচ্ছিল, তারিণী বললে, 'আদা আছে বাড়ীতে? থাকে ত' ওই চায়ের সঙ্গে আদার রস একটু দিয়ে দাও।'

আদার রস-দেওয়া চা এলো। তারিণীর মাথার কাপড় তখন নেমেছে, হাত দু'টিও বেরিয়েছে র‍্যাপারের ভেতর থেকে। মেজবাবুর কেমন যেন দয়া হ'লো লোকটির ওপর। বললেন, 'ছোট ছেলেদের পড়াতে পারবেন আপনি?'

চা খেতে খেতে তারিণী বললে, 'কেন পারব না? থার্ড ক্লাস পর্য্যন্ত পড়েছি।'

মেজবাবুর ছেলে দু'টি মজিলপুর থেকে এসে অবধি একদিনের জন্যও পড়তে বসেনি। 'কলকাতায় যতদিন তারা থাকবে', মেজবাবু বললেন, 'ততদিন আপনি তাদের পড়ান। এইখানেই থাকবেন, খাবেন—'

তারিণী বললে, 'মাইনে?'

'মাইনে পাঁচ টাকা।'

তথাস্তু।

সেই অবধি তারিণী মজিলপুরের বাবুদের বাড়ীতেই রইলো।

বাবুরা কলকাতায় বারোমাস থাকেন না। সেজবাবুর ফুটবল খেলা দেখার সখ বড় বেশি। তাই এই খেলার সময়টায় সপরিবারে তাঁকে আসতেই হয়। আর মেজবাবু আসেন গরমের সময় একবার, আর শীতের সময় একবার। অন্য সময় এলে ছেলেদের পড়ার ক্ষতি হয়, তাই তিনি গ্রীষ্মের ছুটি আর বড়দিনের ছুটি—এই দুটো ছুটি কলকাতায় কাটান।

বড়দিনের ছুটি আর ক'দিনের জন্যই বা! তারিণীকে বেশিদিন ছেলেদের পড়াতে হ'লো না। মেজবাবু সেজবাবু দু'জনেই দেশে চলে গেলেন। কলকাতার বাড়ীতে তারিণী রইলো, একজন রাঁধুনী বামুন রইলো, আর রইলো একজন চাকর। কলকাতায় আর একখানি বাড়ী তাঁদের আছে। সেই বাড়ীর ভাড়া থেকে এদের খরচ চলে। ভাড়া আদায়ের এবং খরচ-পত্রের ভার মেজবাবু তারিণীর ওপরেই দিয়ে গেলেন আর যাবার সময় বলে গেলেন, 'আপনার যতদিন খুশী এ বাড়ীতে আপনি থাকবেন, খাবেন, আর সুবিধেমত একটা কাজ-টাজ যোগাড় ক'রে নিতে পারেন ত' ভালই।'

আনন্দে তারিণীর চোখে জল এলো। মুখ দিয়ে আর কথা বলতে পারলে না।

এইবার সুরু হ'লো মজা!

সকালে উঠে চা খেয়ে তারিণী রোজই বাড়ী থেকে বেরিয়ে যায়। বেরিয়ে যায় সম্ভবত কাজের সন্ধানে। ফিরে আসে দুপুরে খাবার সময়।

এসে প্রায় প্রত্যহই বলে, 'ঠাকুর, আজ আর এবেলা কিছু খাব না।'

ঠাকুর বলে, 'বাঃ, সকালে বেরোবার সময় সেকথা বলে গেলেই পারতেন! ভাতের চাল নিতাম না তা'হলে—!'

তারিণী বলে, 'তাও ত বটে। আচ্ছা কই শোনো ত ঠাকুর, এইখানে এসো দেখি একবার।'

ঠাকুর কাছে এলে তারিণী বলে, 'কই ছ্যাখো ত' আমার এই বাঁ চোখটা একটুখানি লাল হয়েছে কি না!'

ঠাকুর বলে, 'কোথায় লাল। এইজন্যে আপনি খাব না বলেছেন?'

তারিণী বলে, 'হ্যাঁ ভাই, বিদেশ-বিভুঁই জায়গা, একটু সাবধানে না থাকলে—'

ঠাকুর হেসে উঠলো। বললে, 'খান আপনি, কিচ্ছু হবে না, আমি বলছি।'

তারিণী আশ্বস্ত হয়ে বললে, 'খাব তাহ'লে? তুমি বলছো ত'? এ কিছুই নয়। চোখ অমন একটুখানি সবারই লাল হয়—না কি বল?'

ঠাকুর বললে, 'হ্যাঁ, আপনি খান।'

তারিণী স্নানাদি করে' আহারে বসলো এবং অন্য দিনের তুলনায় কিছু কম খেলে না।

এমনি বাই তার দিবারাত্রি লেগেই আছে। সর্দ্দি, কাসি, মাথাধরা, পিঠ-বেদনা, এ-সব ত' নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার, তার ওপর কোথায় যেন বেরিবেরির কথা শুনে এসে অবধি গত কয়েকদিন থেকে তারিণীর ক্রমাগত মনে হচ্ছে—তার যেন বেরিবেরি হয়েছে। পা দুটো মনে হচ্ছে যেন একটুখানি ফুলেছে।

ঠাকুর বললে, 'কোথায় কত্তা, পা তোমার যেমন ছিল তেমনিই আছে।'

ভোলা হাসতে লাগলো।

কিন্তু তারিণীর বিশ্বাস কিছুতেই হ'লো না। পা দুটো দিবারাত্রি টিপে টিপে পায়ে সে বেদনা ধরিয়ে ফেললে। ভাতে নাকি ভাইটামিন থাকে না, তাই সে দু'বেলা রুটি খেতে আরম্ভ করলে, সকালে উঠেই ভিজে ছোলা খেতে লাগলো।

প্রতিদিন দুপুরে যখন সে বাড়ী ফেরে, দেখা যায় জামার পকেটগুলো বোঝাই করে' যত রাজ্যের শাক নিয়ে এসেছে, হিঞ্চে, পুনর্ণবা—এমনি সব আরও কত কি। কোথায় কোন্ কবিরাজ নাকি বলেছে, এই সব শাকের রস খেলে বেরিবেরি সেরে যায়।

বেরিবেরি সারতে না সারতে শহরে এলো বসন্তের মহামারী। দেয়ালে দেয়ালে কর্পোরেশনের নোটিশ পড়লো—'পাড়ায় বসন্ত দেখা দিয়েছে—টিকে নাও!'

তারিণী একদিন টিকে নিয়ে এলো।

রোজ একঝুড়ি করে' নিমের পাতা নিয়ে আসে। বাজার থেকে উচ্ছে আনে। ঠাকুরকে বলে, 'আজকাল এই সব খেতে হয় ঠাকুর। খুব করে' তেঁতো খাও।'

ঠাকুর বলে, 'তুমি খাও কর্ত্তা। তোমার বড় মরবার ভয়।'

তারিণী বলে, 'দেখেছ? তবে আর মূর্খ কাকে বলেছে!'

রাত্রে পথের ওপর দিয়ে 'হরিবোল' বলে' মড়া নিয়ে যায়, তারিণীর সারারাত ঘুম হয় না।

বসন্ত যেতে না যেতেই এলো কলেরা।

গ্রীষ্মকাল। আবার মেজবাবু এলেন দেশ থেকে।

সেজবাবু এলেন ফুটবল খেলা দেখতে।

আবার ছেলেদের পড়াবার ভার পড়লো তারিণীর ওপর। কিন্তু এইবারেই বাধলো গোলমাল। ছেলেরা এক বছরে আর এক ক্লাস ওপরে উঠেছে। অর্থাৎ ছিল ফিফ্‌থ্ ক্লাসে, উঠেছে ফোর্থ ক্লাসে। ছেলেরা সংস্কৃত পড়ে, অ্যাল্‌জ্যাব্রার অঙ্ক কষে, ইতিহাস, ভূগোল—সবই ইংরেজীতে। সর্ব্বনাশ! তারিণী বলে, 'না বাবা, আমার দ্বারা আর চলবে না।'

পাঁচটা টাকা যদিই বা পেতো তাও আর পাবে না। তার ওপর বাড়ীভাড়ার টাকাটা এতদিন সে-ই আদায় করতো, তারই হাতে ছিল এখানকার খরচ। মাস-দুইএর জন্যে তাও তার হাত-ছাড়া হ'লো। মেজবাবুর যে কর্ম্মচারী সঙ্গে এসেছে এবার সে-ই চালাবে।

অথচ তারিণীর খরচ আছে। কবিরাজী ঔষধ খেতে হয়, দু'এক পয়সার অনুপান কিনে আনতে হয় বাজার থেকে, মিছরি কিনতে হয়, মধু কিনতে হয়। একদিন ভাত বরং তার না খেলেও চলে, কিন্তু ওষুধ না খেলে চলে না।

বাবুরা তাকে এখানে থাকতে দিয়েছে, দু'বেলা খেতে দিচ্ছে,—এই যথেষ্ট। তার ওপর তাদের কাছ থেকে ওষুধের দাম সে চাইবে কেমন করে?

নিজের কাছে যা ছিল তাই দিয়ে দু'চারদিন চললো, তারপর আর চলে না।

তারিণী একদিন রাস্তায় ঘুরতে ঘুরতে প্রকাণ্ড এক বাড়ীর মধ্যে দেখলে রাস্তার ধারের চমৎকার সাজানো একটি ঘরের ভেতর ভুঁড়িওলা এক ভদ্রলোক বসে বসে গড়গড়ায় তামাক টানছেন। তারিণী চোখ বুজে সেইখানে ঢুকে পড়লো।

ঘরের ভেতর ঢুকতেই ভদ্রলোক মুখ তুলে তাকালেন। তারিণীকে দেখেই বলে' উঠলেন, 'তোমার আবার কি? কন্যাদায়? আর পারি না বাবা। ওহে ও নবনী, এই নাও আবার এক কন্যাদায় এসে হাজির।'

পাশের ঘর থেকে চশমা-পরা এক বুড়ো এসে দরজার কাছে দাঁড়ালো।

ভদ্রলোক হুকুম করে' দিলেন, 'দশটা টাকা দিয়ে দাও। দিয়ে বিদেয় কর —কি আর করবে বল!'

বলেই তিনি গম্ভীরভাবে আবার তামাক টানতে লাগিলেন। তারিণী কথা বলবার অবসর পেলে না।

দশটি টাকা হাতে নিয়ে তারিণী সেখান থেকে বেরিয়ে এলো। তার মনে হ'তে লাগলো—এ যেন স্বপ্ন।

তারপর থেকে তারিণীর কি যে হ'লো, সে শুধু কলকাতার এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পর্য্যন্ত ঘুরে বেড়াতে লাগলো।

কি যে সে করে, কেন যে সে ঘুরে বেড়ায়, কাউকে কিছু বলে না।

মেজবাবু সেদিন জিজ্ঞাসা করলেন, 'চাক্‌রি-বাক্‌রি হয়েছে নাকি আপনার?'

তারিণী হেসে ঘাড় নেড়ে বললে, 'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

কিন্তু কি চাকরি যে সে পেয়েছে তা' আমরা জানি। বড়লোকের বাড়ী দেখে আর তারিণী সেইখানে ঢুকে পড়ে। নিতান্ত গরীবের মত হাতযোড় করে' বলে—'কন্যাদায়।'

দয়া করে' কেউবা কিছু দান করে, আবার কেউ-বা দূর-দূর ক'রে তাড়িয়ে দেয়।

এম্‌নি করেই তারিণীর দিন চলতে থাকে।

মেজবাবু সেজবাবু আবার মজিলপুরে চলে গেলেন।

কলকাতার বাসা আবার ফাঁকা হ'য়ে গেল। ঠাকুর বললে, 'বাড়ীভাড়ার টাকাটা আদায় করে আনো কর্ত্তা।'

তারিণী গম্ভীরভাবে বললে, 'আমার দ্বারা এখন আর ও-সব কাজ হবে না।'

ঠাকুরেরই সুবিধে। বললে, 'তাহ'লে আমিই যাই, না কি বল কর্ত্তা?'

তারিণী বললে, 'হ্যাঁ, তুমিই যাও।'

তারিণীর মুখে আজকাল হাসি যেন লেগেই আছে। হাসিও আছে, অসুখও আছে।

সেবার তখন শীতকাল। বড়দিনের সময় খবর এলো—মেজবাবু এ-বছর আর কলকাতায় আসবেন না।

তারিণী বললে, 'ভালই হলো, বুঝলে ঠাকুর, বাড়ীঘরদোর যত ফাঁকা থাকে ততই ভালো। অসুখ-বিসুখ কম হয়।'

কিন্তু বাড়ীঘরদোর ফাঁকা থাকা সত্ত্বেও অসুখ একদিন হ'লো।

অসুখ আর কারও হ'লো না। হ'লো তারিণীর।

এবার আর অসুখের বাই নয়—এবার সত্যি-সত্যিই। ঠাকুর-চাকর কেউই প্রথমে বিশ্বাস করেনি, কিন্তু একদিন করতে হ'লো।
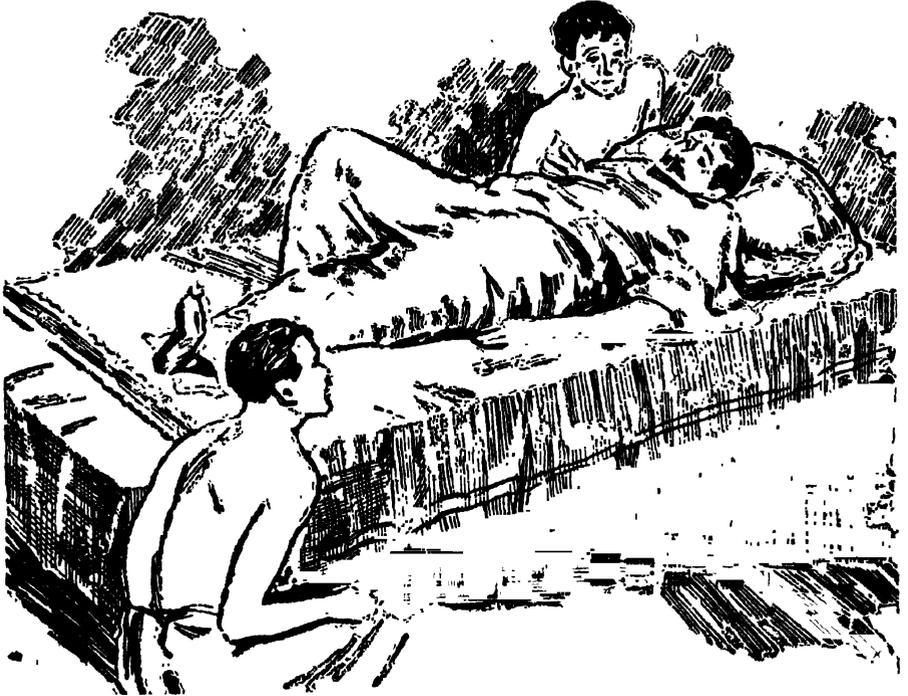
তারিণী সেদিন বিছানায় শুয়ে ছট্‌ফট্ করছে, চোখ দুটো লাল, গা যেন আগুনের মত গরম।

দেখতে দেখতে অসুখ তার বেড়ে গেল।

সেদিন রাত্রে দেখা গেল, তারিণীর চৈতন্য নেই। ডাকলে সাড়া দেয় না।

ঠাকুর, চাকর দু'জনেই ভাবনায় পড়লো।

দেশের বাড়ীতে তার খবর দেওয়া উচিত। কিন্তু কোথায় তার দেশ ?

ঠাকুর বললে, 'দেখা যাক্ ওর জামার পকেটগুলো হাত্‌ড়ে।'

জামাটি সে গায়ে দিয়েই শুয়েছিল।

ঠাকুর জামার পকেট হাত্‌ড়ে অনেক জিনিষ বের করলে। প্রথমেই বেরুলো নানান্ রকমের কবিরাজী ঔষধের বড়ি। তারপর বেরুলো—একটি পকেট পঞ্জিকা। পঞ্জিকার ভেতর একটি কাগজের টুক্‌রোয় দেখা গেল, দেশের এবং এখানকার—দু'জায়গারই নাম-ঠিকানা লেখা আছে।

তারপর জামার ভেতরের পকেটে হাত পড়তেই ঠাকুর চম্‌কে উঠলো। একটি কাপড়ের পুঁটুলিতে বাঁধা অনেকগুলি টাকা, আর একদিকে প্রকাণ্ড এক তাড়া নোট!

ঠাকুর সেইদিনই ভোলা চাকরকে তার দেশে পাঠিয়ে দিলে।

তারপর তারিণীর টাকাগুলো নিয়ে সে ভাবতে বসলো। অনেক টাকা। টাকা ও নোটগুলো গুণে দেখলে—প্রায় তিন হাজার! ঠাকুরের মত একটা লোকের সারা জীবনের সংস্থান। ভাবলে, পালাবো নাকি ?

কিন্তু পালাবার অবসর সে পেলে না।

তারিণীর দেশ থেকে ভোলা ফিরে এলো। এসে বললে, কোথায় পাবে ঠাকুর, সেখানে তারিণীর কেউ নেই। গ্রামে বাড়ী একটা ছিল, সেটাও সে বিক্রী করে' দিয়ে চলে এসেছে।'

তারা দু'জনে বসে বসে তারিণী সম্বন্ধেই আলোচনা করছে, এমন সময়

দরজার কাছে আচম্‌কা একটা শব্দ শুনেই তারা তাকিয়ে দেখলে, বিছানা থেকে তারিণী নিজেই উঠে এসেছে। এসেই বললে, 'আমার টাকা ?'

ঠাকুরের মুখের পানে তাকিয়ে ভোলা জিজ্ঞাসা করলে, 'টাকা কিসের ঠাকুর ?'

ঠাকুর উঠে দাঁড়ালো। তারিণীকে দু'হাত দিয়ে ভাল করে' চেপে ধরে বললে, 'জ্বর গায়েই উঠে এলে কত্তা ? চল—শোবে চল।'

তারিণী বললে, 'শোবো পরে। আগে আমার টাকা দাও।'

ঠাকুর তাকে জোর করে' তুলে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিলে বিছানায়। তারিণী জ্বরের ঘোরে চীৎকার করতে লাগলো, 'আমার টাকা, আমার টাকা—!'

ঠাকুর মহা বিপদে পড়লো। ভেবেছিল, বলবে না। কিন্তু তার চীৎকারের চোটে তাকে বলতে হ'লো। বললে, 'টাকা আছে আমার কাছে। তুমি আগে সেরে ওঠো, তারপর নিও।'

তারিণী জ্বরের ঘোরে আবার বেহুঁস্ হয়ে পড়লো। টাকার কথা ছেড়ে অন্য কথা বলতে লাগলো।

ঠাকুর যেন হাঁফ্ ছেড়ে বাঁচলো। তাড়াতাড়ি ঘর থেকে সে বেরিয়ে আসছিল, দেখলে, ভোলা দরজার কাছে দাঁড়িয়ে।

ভোলা বললে, 'বুঝেছি ঠাকুর, টাকাগুলো তোমার মেরে দেবার মতলব। তা' হবে না।'

ঠাকুর বললে, 'কোথায় টাকা। কত্তা কি রকম মানুষ জানিস্ ত ? জ্বরের ঘোরে টাকা টাকা করছে।'

ভোলার কিন্তু বিশ্বাস হ'লো না।

এই নিয়ে কথা কাটাকাটি হ'তে হ'তে দু'জনের তুমুল ঝগড়া !

ভোলা কিছুতেই ছাড়বার পাত্র নয়—সে বললে, 'আমাকে টাকার ভাগ দিতে হবে।'

ঠাকুর বললে, 'টাকা নেই।'

ভোলা তাকে এমন মার মারলে যে, ঠাকুরের হাঁটু দিয়ে ঝর্ ঝর্ করে রক্ত গড়াতে লাগলো।

ভোলা ভাবলে, আচ্ছা হয়েছে, ঠাকুর আর বাড়ী থেকে বেরুতে পারবে না। এই অবসরে তাড়াতাড়ি সে পোষ্টাপিসে গিয়ে মজিলপুরে মেজবাবুকে এক টেলিগ্রাম করে দিয়ে এলো।

কিন্তু সর্ব্বনাশ! এসেই দেখে ঠাকুর নেই।

সেই খোঁড়া অবস্থাতেই সে পালিয়ে গেছে।

এদিকে তারিণী আবার টাকা টাকা আরম্ভ করেছে।

সন্ধ্যায় মেজবাবু এলেন।

তারিণীর অবস্থা দেখে ডাক্তারেরা ব্যবস্থা করলেন। ভোলার কাছে ঠাকুরের কথা শুনে ত অবাক্!

তারিণী টাকা টাকা করছে! টাকা না পেলে সে বাঁচবে না।

মেজবাবু কি করবেন, ভাবতে লাগলেন।

দিনকয়েক পরে, হঠাৎ একদিন পুলিশের লোক তাঁর বাড়ীতে এসে উপস্থিত!

জিজ্ঞাসা করলে, 'তারিণী মুখুজ্যে আপনাদের লোক?'

মেজবাবু বললেন, 'হ্যাঁ।'

লোকটি বললে, 'সে নাকি শ্যামবাজারের মোড়ের মাথায় বাসের তলায় চাপা পড়ে মরেছে। মড়া পড়ে আছে কারমাইকেল হাসপাতালে। তার জিনিষপত্র থেকে তার ঠিকানা পাওয়া গেছে।'

মেজবাবু ও ভোলা হাসপাতালে গিয়ে দেখে—ঠাকুর।

ঠাকুরকে তারিণী মুখুজ্যে বলে ভ্রম করবার কারণ—একটা পুঁটুলি ও খামের মোড়ক্ ছিল তার সঙ্গে, তাতে লেখা ছিল—তারিণী মুখুজ্যে। আর এই বাড়ীর ঠিকানা।

তারিণীর টাকা পাওয়া গেল।

তারিণী তখন সেরে উঠেছে।

তারিণী বললে, 'বলেছিলুম কি-না, নিজের নাম-ঠিকানা লিখে পকেটে রাখতে হয়, নইলে কলকাতা শহর—কখন্ যে কোন্ সময় অপমৃত্যু ঘটে—কে জানে!'
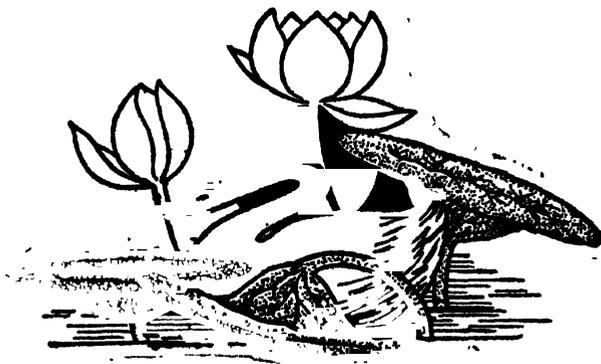
—শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

—এক-

রাজার ফুলবাগান—গাছ আলো ক'রে থাকে রঙবেরঙয়ের ফুলে, বাগানের চারিধারের তারের বেড়ার আড়ালে অনেক দূর থেকেও দেখা যায় ফুলের রং, ফুলের রূপ।

নানা গাছের সবুজ পাতার আড়ালে ফুলেরা থাকে কুঁড়ির ঢাকনির আড়ালে, সবুজ ঘোমটা তুলে একটু করে উঁকি দেয়; বাতাস এসে তাদেরই যায় দুলিয়ে, অনুনয় বিনয় করে—"ঘোমটা খোল ফুলরাণি, সবুজ ঘোমটা খোল।"

যেমন তা'দের রূপ, তেমনি তা'দের গন্ধ। সেই রূপ ও গন্ধে আকৃষ্ট হ'য়ে কত দূর হ'তে ছুটে আসে কত নাম না জানা পাখী; তা'রা গান গায় হাজার রকম সুরে; ছুটে আসে প্রজাপতিরা—ফুলে ফুলে বেড়িয়ে বেড়ায়।

দুনিয়ার যত ভালো আর আশ্চর্য্য ফুল আছে, রাজা সব গাছ এনে লাগিয়েছেন তাঁ'র বাগানে। বাগানে ফুল ফুটানোর সখ তাঁ'র ষোল আনা, দেশ-দেশান্তর হতে লোক আসে রাজার ফুলবাগান দেখ্‌তে।

রাজা রাজকার্য্য করেন, প্রাণমন পড়ে থাকে ফুলবাগানের দিকে। কোন্ ফুলটা সবুজের আড়াল হ'তে কেবলমাত্র উঁকি দিচ্ছে, কোন্ ফুলটা সহস্রদল মেলেছে, কোন্ ফুলটার পাপড়ি খস্‌তে সুরু হয়েছে সব যে কোন দিন তিনি বলে দিতে পারেন।

রাজা দোতালায় খোলা জানালার কাছে শুয়ে ফুলের বাগান দেখেন, ফুলের গন্ধে বিভোর হ'য়ে ঘুমিয়ে পড়েন।

—দুই—

এক ঝাঁক পাখী রাজার ফুলবাগানে এসে ভারী উপদ্রব সুরু ক'রেছে।

মালিরা তা'দের দৌরাত্ম্যে অস্থির। এত ছোট পাখী, লম্বায় এক আঙ্গুলের বড় নয়। লাল টুক্‌টুকে তা'দের দু'খানা পাখা, ঠোঁট আর চোখ, গা-টি নরম ও সবুজ।

তা'দের ফুলচুরির প্রধান সহায় হ'ল তা'দের গায়ের রঙ্। মালিরা ঠিক করিতে পারে না—কোন্‌টা ফুল, কোন্‌টা পাখী, কোন্‌টা পাতা; রঙে রঙ মিলে সব হ'য়ে যায় একাকার। মালিরা তীর-ধনু ঠিক করে, ভয়ে তীর ছুড়তে পারে না—পাছে ফুলের পাপড়ি ছিঁড়ে গিয়ে খসে পড়ে।

পাখীর দল প্রজাপতির মত ফুলে ফুলে বসে, ছোট ছোট লাল টুক্‌টুকে ঠোঁট

দিয়ে পাপড়িগুলো উল্টোয় পাল্টায়, ছিঁড়ে কুচি কুচি ক'রে মাটিতে ফেলে দেয়। এতে তা'রা কি আমোদ পায় তা'রাই জানে।

রাজা জানালা হ'তে ফোটা ফুল দেখতে পান না—

এ কি ব্যাপার,—এর মানে?

প্রধান মালির তলব পড়ে—

প্রধান মালি ভয়ে ভয়ে এসে হাত জোড় ক'রে দাঁড়ায়।

রাজা বজ্রস্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, "ফুল আর গাছে ফোটে না কেন, গাছের আর যত্ন করা হয় না বুঝি?"

প্রধান মালি কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে বলতে গেল, "মহারাজ, কতকগুলো পাখী—"

রাজা হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন, "পাখী—কতকগুলো পাখী, তুমি কি বলতে চাও পাখীরা ফুল ফুট্‌তে দেয় না?"

হাত জোড় ক'রে প্রধান মালি বললে, "হুজুর তাই, আপনি নিজে যদি একদিন স্বচক্ষে দেখেন।"

রাজা বললেন, "আজই যাব।"

রাজকার্য্যের ভার রইল মন্ত্রীর ওপর, রাজা গেলেন বাগানে।

এইবারই বাধলো মজা।

রাজার মাথায় মুকুট ঝিল্‌মিল্ করছে, পোষাক ঝিল্‌মিল্ কর্‌ছে, তাই দেখে ছোট পাখীগুলো দলশুদ্ধ পড়লো রাজার ওপর ঝাঁপিয়ে। কেউ ঠুক্‌রায় মুকুট, কেউ পোষাক, কেউ তলোয়ার। রাজার অবস্থা তখন যা' হলো—সে আর বলবার নয়। রাজা দুইহাত শূন্যে তুলে লাফান, পাখীদের মারতে যান, কিন্তু তাঁ'র কিল, ঘুসি একটা পাখীর গায়েও লাগে না। তাঁ'র চীৎকারে একশো মালি ছুটে আসে, সিপাই-শান্ত্রী ছুটে আসে।

কিন্তু এলেই বা কি ? তা'রা সঙের মত দাঁড়িয়ে থাকে—একটা পাখীকেও মারতে পারে না—পাছে রাজার গায়ে লাগে।

রাজা চেঁচান—"রক্ষা কর—রক্ষা কর—রক্ষা কর।"

কিন্তু কে তাঁ'কে রক্ষা করতে গিয়ে মেরে ফেলবে ?

অবশেষে হতভম্ব প্রধান মালি দৌড়াল মন্ত্রীর কাছে—যদি তিনি কোন মন্ত্রণা দেন। মন্ত্রী ছুটে এলেন।

লক্ষ্য করে বুঝলেন—পাখীদের লোভ আসলে রাজার উপর নয়, ঝিল্‌মিল্‌ জিনিষগুলোর উপর। বুদ্ধি ক'রে তখনই তিনি রাজার মুকুট, পোষাক আর তলোয়ার নিয়ে ফেলে দিলেন। রাজা হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন,—কপালের ঘাম মুছে সরে দাঁড়ালেন।

মন্ত্রী বিবেচনা ক'রে বললেন, "এ পাখীদের মারা যাবে না, খুব জোরে কোন আওয়াজ কর, তা'তে পাখীরা ভয় পেয়ে যদি পালায়।"

মন্ত্রীর বুদ্ধিতে পাখীর ঝাঁককে তাড়ান গেল। কিন্তু একটা পাখী পালাতে গিয়ে বেড়ায় গেল আট্‌কে—রাজা নিজের হাতেই তলোয়ার দিয়ে খুঁচিয়ে তা'কে মেরে ফেল্‌লেন।

সেইদিনই গভীর রাত্রে একটা বিকট শব্দে রাজার ঘুম ভেঙ্গে গেল ; মনে হ'ল—বাগানের উপর দিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাসের ঝড় বয়ে গেল।

—তিন—

সকালবেলাই প্রধান মালির চীৎকার—"মহারাজ, মহারাজ, সর্ব্বনাশ হ'য়েছে।" ধড়ফড় ক'রে উঠে রাজা জিজ্ঞাসা করেন, "কি ?"

মালি কেঁদে ফেলে বললে, "ফুলগাছ শুয়ে পড়েছে হুজুর, পাতা সব নুইয়ে পড়েছে।" রাজা দুইচোখ কপালে তুলে বাগানে ছুটে যান।

একটীমাত্র ফুলগাছে একটীমাত্র ফুল ফুটে রয়েছে ঠিক বেড়ার ধারে—আর মাইলের পর মাইলব্যাপী গাছ মাটিতে শুয়ে ; মনে হচ্ছে, কাল রাত্রে ভীষণ ঝড়ের দমকা বয়ে গেছে এদের উপর দিয়ে।

কত লক্ষ লক্ষ টাকা—আর কত যত্ন, ভালবাসা—

রাজা যেন পাগল হ'য়ে উঠ্‌লেন। এরকম কেন হ'ল ; কোন্ দেবতার শাপে তাঁ'র এত বড় বাগানের এ অবস্থা হ'ল ?

মন্ত্রী এলেন, সভাসদবৃন্দ সবাই এলো—সহর হ'তে আনা হ'ল বড় বড় জ্যোতিষী, তা'রা কেউ গুণে যদি ঠিক ক'রে বলতে পারে—আর গাছগুলোকে আবার তাজা করার উপায় বলে দেয়, তা'দের উপযুক্ত পুরস্কার দেওয়া হবে।

প্রধান জ্যোতিষী খড়ি দিয়ে অনেক আঁক কষে শেষে গম্ভীর মুখে বললেন, "সর্ব্বনাশ হয়েছে মহারাজ, আপনার বাগান পরীর দৃষ্টিতে পড়েছে। পাখী হ'য়ে যা'রা উপদ্রব করতো তা'রা সব পরী। একদিন এখান দিয়ে চলে যেতে ফুলের রূপে আকৃষ্ট হ'য়ে তা'রা পাখীর রূপ নিয়ে এখানে আটক পড়েছিল। আপনি তা'দের একটীকে মেরে ফেলেছেন, পরীর দীর্ঘশ্বাসে তাই আপনার ফুলবাগান শুকিয়ে উঠেছে।"

রাজা মাথায় হাত দিয়ে বসেন—"এখন উপায় ? কি করলে পরীর দৃষ্টি এড়ানো যাবে ?"

জ্যোতিষী বললেন, "ওই যে একটীমাত্র গাছে একটীমাত্র ফুল ফুটে আছে, ওইটী নিয়ে যেতে হবে সেই সাতসমুদ্রের ওপারে নীলদ্বীপে, সেইখানে থাকে নীল-পরীদের রাণী। তা'কে যদি কোন রকমে খুসী করতে পারেন, আপনার বাগান আবার তাজা হ'য়ে উঠবে।"

রাজা জ্যোতিষীকে বকশিস্ দিয়ে বিদায় করে তখনই সাতসমুদ্রের ওপারে নীলদ্বীপে যাওয়ার উদ্যোগ করেন।

রাণী আছ্ড়ে পড়ে কাঁদেন—"যেয়ো না," ছেলে হাত ধরে কাঁদে—"যেয়ো না" কিন্তু রাজার ফুলবাগান একদিকে, আর সব একদিকে।

রাজার ময়ূরপঙ্খী নৌকা তৈরী হ'ল, রাজা তেত্রিশকোটি দেবতাকে প্রণাম ক'রে সেই একটী গাছের একটী ফুল তুলে নিয়ে ময়ূরপঙ্খীতে উঠলেন।

ঠিক সেই সময় মাথার উপর দিয়ে ঝড়ের মত একটা দমকা বয়ে গেল। তীক্ষ্ণস্বরে কে যেন বলে গেল—"সাবধান—সাবধান—সাবধান।"

রাজা চমকে ওঠেন—মন্ত্রী চারিদিকে চান, কে একথা বললে? সবাই তাকায় পরস্পরের দিকে—কেউ তো একথা বলে নি।

রাজার ময়ূরপঙ্খী অথই জলে সাগর বুকে ভাসলো। রাণী সাতমহল বাড়ীর ছাদে দাঁড়িয়ে দেখেন, নৌকো ভাসতে ভাসতে চলে যাচ্ছে, রাজপুত্র মায়ের পাশে দাঁড়িয়ে দেখে, ময়ূরপঙ্খীর রঙিন হাল নীল আকাশের বুকে মিলিয়ে গেল।

মা ছেলে দু'জনে আছ্ড়ে-পিছ্ড়ে করে কাঁদেন!

—চার—

দিনের পর দিন যায়, বৎসরের পর বৎসর যায়, রাজা আর রাজ্যে ফিরলেন না। রাজ্যময় বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হলো—চুরি, ডাকাতি, লুঠ চললো। রাজার বড় সাধের ফুলবাগানের বেড়া ভাঙ্গতে সুরু করলে, কিন্তু আশ্চর্য্য বৎসরের পর বৎসর ধরে গাছগুলো একইভাবে পড়ে রইলো—একটী পাতাও তা'দের শুকালো না। বাগানের এক কোণে একটী গাছে একটী ক'রে ফুল প্রত্যহ ফুটতে লাগলো, কোন দিনই ফোটা বন্ধ হ'লো না।

রাজপুত্র অরুণকুমার মায়ের কাছে অনুমতি চায়—"তুমি আদেশ দাও মা, আমি বাবাকে আনতে যাই। পরীরা হয়তো বাবাকে বন্দী ক'রে রেখেছে, চাকরের মত খাটাচ্ছে, আমি বাবাকে নিয়ে আসি।"

রাণী কাঁদতে কাঁদতে ছেলেকে বুকের মধ্যে টেনে নেন, "তুই কি পারবি অরুণ, তুই যে বড় ছেলেমানুষ।"

অরুণ হাসে—বলে, "আমি মস্ত বড় হয়েছি তবুও তুমি আমায় ছেলেমানুষ বল। তের বছর বয়েস আমার—তুমি আমায় ছেলেমানুষ বলো না। এক বছর তুমি অপেক্ষা করো, এক বছরের মধ্যে আমি বাবাকে নিয়ে ময়ূরপঙ্খী নৌকো নিয়ে ফিরে আসবো দেখো।"

রাণী আর কি করেন!

ছেলের জিদে তা'কে বিদায় দিতেই হ'ল।

রাজপুত্র বাগানের সেই একটীমাত্র ফুল তুলে নিলে। জ্যোতিষীর কাছে সে শুনেছিল—এই একটীমাত্র গাছ যে পরীর দৃষ্টি এড়াতে পারে। এই একটী-মাত্র ফুল যা'র কাছে যতক্ষণ থাকবে, পরী ততক্ষণ তা'র কোন অনিষ্ট করতে পারবে না। এই ফুল হারানর সঙ্গে সঙ্গে সে আগেকার সব কথা ভুলে যাবে এবং পরীর মায়ায় পড়তে হবে।

রাজপুত্র অরুণকুমার একটা ছোট্ট নৌকায় উঠলো, চারজনমাত্র দাঁড়ি-মাঝি তাতে।

রাণী কাঁদতে কাঁদতে আশীর্ব্বাদ ক'রে ছেলেকে বিদায় দিলেন।

রাজপুত্র অরুণকুমারের নৌকো ভেসে চললো সাতসাগরের ওপারে নীল-দ্বীপের উদ্দেশ্যে—যেখানে নীলপরীর কাছে তা'র বাপ বন্দী হ'য়ে রয়েছে।

নৌকোর ঠিক সামনে আকাশের কোল বেয়ে চলছিল একটা পাখী—

সেই পাখীটাই যেন অরুণকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলছিল। বুড়ো মাঝি বলছিল, "এ রকম পাখী মাঝে মাঝে দেখতে পাওয়া যায়, এরা পথ দেখিয়ে নিয়ে চলে।"

দিনের পর দিন যায়, জলের আর শেষ নাই। কোথায় সাতসাগরের পারে সেই নীলদ্বীপ—চিহ্নও দেখা যায় না।

জ্যোতিষীর কথার পরে অরুণের অগাধ বিশ্বাস। বুড়ো মাঝি মাঝে মাঝে আবল তাবল বকে, বলে—'জ্যোতিষী মিছে কথা বলেছে।' কিন্তু কুমার তা' বিশ্বাস করে না।

ফুলটাকে সে সব সময়ে নিজের কাছে রাখে।

আশ্চর্য্য—দিনের পর দিন, মাসের পর মাস যায়, ফুলটা যেমন তাজা তেমনই তাজা রয়েছে, একটা পাপড়ি তার শুকায় নি, রঙ্ পর্য্যন্ত খারাপ হয় নি।

অনেক দিন পরে দাঁড়ি-মাঝিরা চীৎকার ক'রে উঠলো, "একটা দ্বীপ দেখা যাচ্ছে।"

ওই-ই তা'হ'লে নীলদ্বীপ।

কুমারের আর আনন্দ দেখে কে?

রাত্রে আকাশ ছেয়ে গেল ঘন কালো মেঘে, সোঁ সোঁ ক'রে ঝড় এলো।

অরুণ বুঝতে পেরেছে এ সব পরীর মায়া, সে ফুলটাকে জামার পকেটে রেখে সূতা দিয়ে পকেটটাকে এমন করে সেলাই করলে যাতে কিছুতেই সে ফুল পড়ে যাবে না।

সোঁ সোঁ ক'রে একটা ভীষণ দমকা ঝড় এসে ছোট্ট নৌকাখানাকে শুদ্ধ দ্বীপের উপর আছ্ড়ে ফেললে।

পড়বার সেই ভীষণ আঘাতে অরুণ মূর্চ্ছিত হ'য়ে পড়ল ; মাঝি-মাল্লারা নৌকো হ'তে কে কোন্‌দিকে ছিট্‌কে পড়ল, কেই বা তা'র হিসাব রাখে, কেই বা তা' দেখে ?

—পাঁচ—

পূবের লাল আলো ধরার গায়ে পরশ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অরুণের মূর্চ্ছার ভাব কেটে গেল, সে ধড়ফড় ক'রে উঠে বসলো।

তাড়াতাড়ি পকেটে হাত দিয়ে দেখলে— না, ফুলটা ঠিক আছে। তবে সে পরীর মায়ায় কিছুতেই পড়বে না, তাই পিতাকে সে নিশ্চয়ই মুক্ত ক'রে নিয়ে যেতে পারবে।

মাথার উপর দিয়ে কে যেন বিদ্রূপের হাসি হেসে গেল—হা—হা – হা—

অরুণের গা' কাঁটা দিয়ে উঠলো, সে মুখ তুলে চাইলে, কোথাও কিছু দেখ্‌তে পেলে না।

অরুণ সামনের দিকে এগিয়ে চললো।

কি সুন্দর পথ, যেন মোমে তৈরী—তু'ধারে কত ফুলগাছ, কত ফুল ফুটেছে। এক জায়গায় তার বয়সী অনেকগুলি ছেলেমেয়ে খেল্‌ছে। অরুণকে দেখে তা'রা কাছে দৌড়ে এলো—"কে ভাই তুমি, কোন্ দেশের রাজপুত্তুর ? এসো না, আমাদের সঙ্গে কাণামাছি খেল্‌বে।"

কাণামাছি হওয়ার ফাঁকে ফুলটি যাবে।

অরুণ মাথা নাড়্‌লে, গম্ভীরভাবে এগিয়ে চললো। খানিকদূর যেতেই পেছনে হো হো, হা হা হাসির শব্দ শুনে পেছন ফিরে দেখে, সব মিলিয়ে গেছে।

পথে দেখা গেল, কত হিংস্র জন্তু তা'রা হাঁ ক'রে খেতে চায়, কিন্তু কাছে আসতে পারে না। চট ক'রে সামনে একখানি লম্বা মাটি চিরে বা'র হয়ে পড়লো

স্রোতবতী এক নদী। অরুণ ভয় না পেয়ে নদীর জলে দিলে পা—তখনি সে নদী গেল শুকিয়ে। সামনে জেগে উঠলো মস্ত বড় পাহাড়, তখনি গেল মিলিয়ে। যেতে যেতে সামনে জাগলো মস্ত বড় গর্ত্ত—পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গর্ত্ত মিশে গেল।

এ সবের জন্যে অরুণ প্রস্তুত হ'য়ে এসেছিল। তা'র কাছে যতক্ষণ ফুল থাকবে ততক্ষণ কেউই তা'র এতটুকু অনিষ্ট করতে পারবে না, তা'র মাথার চুলও নড়াতে পারবে না—তা' সে জানে। সে পকেটের উপর হাতখানা রেখে সোজা হন হন ক'রে চললো।

কোথায় বাজে বাঁশী—কি মিষ্ট সে বাঁশীর সুর—মুহূর্ত্তের জন্য অরুণ যেন অভিভূত হ'য়ে পড়লো। এমন বাঁশীর সুর সে খুব কম শুনেছে।

সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়লো—মা বলেছেন, পরীরা মায়া জানে, তা'রা মায়া ক'রে মানুষকে ভেড়া, গরু, পাখী, যা' খুসী করতে পারে।

অরুণ দেখ্‌তে পেলে একটী ফুলের বাগানে লক্ষ লক্ষ ফুল ফুটেছে, সেখানে কোমল দূর্ব্বার উপর কত সুন্দরী মেয়ে—কেউ গান গাইছে, কেউ নাচছে, কেউ বাঁশী বাজাচ্ছে। মাঝখানে রত্নাসনে বসে আছে পরমা সুন্দরী একটী মেয়ে।

অরুণকে দেখেই সে উঠে দাঁড়াল—"এসো, এসো কুমার, আমরা তোমার জন্যে বসে আছি। এই নাও—সিংহাসন নাও, মুকুট নাও, মালা নাও; সব নাও—তুমি এখানকার রাজা হ'য়ে বাস কর।"

অরুণ একবার পকেটে হাতখানা রাখলে তারপর থু থু করে কতকটা থুথু তা'দের দিকে ছুড়ে দিলে।

দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সব গেল মিলিয়ে, কোথায় গেল সেই সব পরীরা, কোথায় গেল ফুলবাগান, পাখীর গান—সেখানে জেগে উঠলো ধূ ধূ মরুভূমি, গাছ নাই, ঘাস নাই, লতা নাই—পাতা নাই।

অরুণ দেখতে পেলে দূর হ'তে একটী লোক আসছে—সে যেন হাঁটতে পারছে না, পা তা'র ভেঙ্গে পড়েছে। তা'র মাথার সব চুল সাদা হ'য়ে গেছে, একমুখ সাদা দাড়ি-গোঁফ, হাতে পায়ে বড় বড় নখ।

অরুণ প্রথমটা থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে রইল—তারপরই চোখের দিকে চেয়ে সে চিনতে পারলে, এই তা'র বাবা—

"বাবা- বাবা—"

অরুণ দুই হাত তুলে তা'র বাবার কোলে ছুটে গেল।

রাজা প্রথমটা চিনতে পারেন নি, তারপরই চিনতে পেরে ছেলেকে বুকের মধ্যে চেপে ধরে ঝর্ ঝর্ ক'রে চোখের জল ফেলতে লাগলেন।

—ছয়—

মাঝি-মাল্লাদের খুঁজে অরুণ নৌকো ঠিক ক'রে পিতাকে নিয়ে নৌকোয় উঠলো।

পরীর মায়ায় আকাশ তখন কালো মেঘে ছেয়ে এসেছে। নীলদ্বীপে তখন ভূমিকম্প, অগ্নিবর্ষণ সুরু হয়েছে। চারিদিকে হুম-হাম, দুমদাম শব্দ, কান্না-হাসি, তর্জ্জন-গর্জ্জন সে সব শব্দে কানপাতা দুরূহ।

রাজা বললেন, "কিছু করতে হবে না, একশোবার দেবতার নাম ক'রে নৌকো ছাড়লেই সব ঠিক হ'য়ে যাবে!"

একশোবার দেবতার নাম ক'রে নৌকো ছাড়া হ'ল। আকাশ হ'য়ে গেল পরিষ্কার— শব্দ সব মিলিয়ে গেল।

নৌকো সাগরের বুক চিরে সোঁ সোঁ ক'রে ভেসে চললো।

রাজার সব কথা শোনা গেল।

রাজা আসতে গিয়ে ঝড়ের বেগে নীলদ্বীপে আছড়ে পড়েন. ফুলটা সেই সময়েই হারিয়ে যায়।

পরীরা তাঁকে সিংহাসন, মুকুট দেওয়ার লোভ দেখায়, রাজা সহজেই ভুলে যান।

তারপর হ'ল দুর্গতির একশেষ।

রাজা ক্রমে ক্রমে সব কথা ভুলে গেলেন; তা'দের চাকর হয়ে সেখানে বাস করতে লাগলেন। এক একদিন মুহূর্ত্তের জন্য জ্ঞান হতো, কিন্তু দেশে ফিরবার কোন উপায় পেতেন না।

দেশে ফিরেই কুমার আগে নাপিত ডেকে পিতার চুল, নখ সব পরিষ্কার ক'রে নিয়ে তাঁ'র পোষাক-পরিচ্ছদ পরিয়ে বাড়ী নিয়ে গেল।

রাণীর চোখের জল আর মানে না—উপ্‌ছে উপ্‌ছে পড়ে।

রাজ্যময় সোরগোল, রাজা ফিরে এসেছেন—রাজ্যময় উৎসব সুরু হ'ল।

* * * *

রাজার বাগানে আবার ফুল ফুটলো। রাজা জানালায় দাঁড়িয়ে দেখেন—শোয়া গাছগুলি সটান হ'য়ে দাঁড়িয়েছে, আবার নূতন নূতন পাতা জন্মালো, কুঁড়ি ধরলো, ফুল ফুটলো।

আকাশের বুক হ'তে আবার বয়ে আসে দক্ষিণ হাওয়া; ভ্রমর, প্রজাপতিরা আবার ছুটে এলো।

রাজা শুধু তাকিয়ে থাকেন, চোখের পলক তাঁ'র পড়ে না।

গল্পের শেষে

—শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র
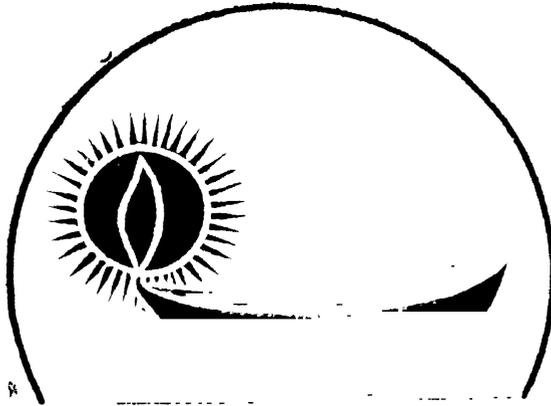
বর্ষাকাল, সুতরাং বৃষ্টি ত হবেই। কিন্তু সারাদিন সমানে জল পড়বার পর রাত্তিরেও তার এমন বিরাম হবে না জানলে আমরা বোধ হয় সেই কলকাতা ছেড়ে এই অজ পাড়াগাঁয়ে ফুটবল খেলার লোভে আসতাম না।

জায়গাটা যে এমন পাণ্ডববর্জ্জিত দেশ তাইবা কে জানত! খবরের কাগজে নসীপুরে নগেন্দ্র মেমোরিয়াল শিল্ডের নাম দেখে ভবেশ একটা এন্ট্রি করে দিয়েছিল। ভবেশ আমাদের দি আন্‌বীট্‌ন্ ইলেভেনের অত্যন্ত উৎসাহী কর্ম্মঠ সেক্রেটারী। খেলাটা ফুটবল এবং এন্ট্রি-ফি আট আনার নীচে থাকলে সে চোখ বুজে একটা চিঠি ছেড়ে দেবেই—তা সে খেলা যেখানেই হোক না কেন। আন্‌বীট্‌ন্ ইলেভেন্ তার ছ'মাসের পরমায়ুতে এ পর্য্যন্ত কাউকে পরাস্ত করতে পারেনি, সেদিক দিয়ে আমাদের রেকর্ড আন্‌বীট্‌ন্ সত্যিই। চাঁদা দেওয়া ও একবার করে মাঠে নামাই সার। কিন্তু ভবেশের উৎসাহ তাতে দমবার নয়।

গোড়ার দিকে কলকাতার একটু-আধটু-নাম-করা 'শিল্ড' বা 'কাপেই' নামতে গিয়ে আমাদের একটু অসুবিধা হয়েছে একথা স্বীকার করা ভালো। দর্শকেরা আমাদের খেলায় উৎসাহিত হয়ে এমন হাততালি দিতে সুরু করেছে যে, খেলা শেষ হয়ে গেলেও তা থামেনি, অনেকে হাততালি দিতে দিতে আমাদের পেছনে বাড়ি পর্য্যন্ত এসেছে এ আমার নিজের চক্ষে দেখা। আমরা হেরে গেলেও খুব খারাপ খেলি না। কিন্তু ভালো খেলেও এতটা আমাদের নিয়ে বাড়াবাড়ি করা

ঠিক বরদাস্ত করতে পারছিলাম না। শেষের দিকে তাই কলকাতা ছাড়িয়ে মফস্বলের শহর এবং মফস্বলের শহর ছাড়িয়ে পাড়াগাঁয়ের দিকে আমাদের ঝোঁক একটু বেশী হয়েছে।

কিন্তু পাড়াগাঁয়েরও একটা সীমা আছে—নসীপুর তার বাইরে। নগেন্দ্র মেমোরিয়াল শিল্ডের কর্ম্মকর্ত্তারা আমাদের চাঁদা পেয়ে খুশী হয়ে জানিয়েছিলেন যে, ষ্টেশন থেকে এক পা গেলেই তাঁহাদের ক্লাব ও খেলার মাঠ। আমাদের কোন কষ্টই হবে না। ষ্টেশনে তাঁরা লোকও রাখবেন। লোক বলতে ষ্টেশন-মাষ্টার ও এক পা বলতে ঘটোৎকচের পা সেটুকু তাঁরা উহ্য রেখেছিলেন।

অবিশ্রান্ত বৃষ্টির ভিতর তিনটে নাগাদ প্যাসেঞ্জার ট্রেণে গিয়ে যখন নসীপুর নামলাম, তখন প্রথমে ত মনে হল গাড়ী বোধ হয় সিগন্যাল না পেয়ে মাঠের মাঝে থামাতে আমরা ভুল করে নেমে পড়েছি। এ আবার ষ্টেশন নাকি! প্ল্যাটফর্ম্ম না থাক, মাটিতে খানিকটা লাল কাঁকরও ত বেছানো থাকে! হুড়মুড় করে আবার ট্রেণে উঠে পড়তে যাচ্ছি, এমন সময় উদয় খুব পর্য্যবেক্ষণ করে বল্লে—"নারে ষ্টেশনই বটে, দেখছিস না দু' একটা কাঁকর পড়ে রয়েছে। বাকী সব জলে ধুয়ে গেছে!"

কাঁকর দেখে আশ্বস্ত হয়ে সামনে চাইলাম। বৃষ্টির ভিতর দূরে যেন একটা ভাঙা গাছও দেখা গেল। গাছ নয় সেটা ষ্টেশনের নাম লেখা সাইন পোষ্ট। বৃষ্টিতে নীচের মাটি আলগা হয়ে একটু হেলে পড়েছে। সাইন পোষ্টের পর দূরে একটা ঘর এবং তার ভিতরে একজন ষ্টেশন মাষ্টার টিকিট কালেক্টরকেও পাওয়া গেল। তাঁর হাতে রিটার্ণ টিকিটের অর্দ্ধেক দিয়ে রাস্তা জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি একটা কাটা খাল দেখিয়ে দিলেন মনে হ'ল। 'ওটা যে খাল মশাই, যাব কি করে নৌকো না হ'লে!' ষ্টেশন মাষ্টার বুঝিয়ে

দিলেন, খাল নয় ওটাই রাস্তা, বৃষ্টিতে ওই অবস্থা হয়েছে। শুনলাম সেই রাস্তায় সাঁৎরে ও কাদা ঠেলে ক্রোশ দু' এক গেলে নসীপুর গ্রাম পাওয়া যাবে, যদি না বন্যায় সেটা ভেসে গিয়ে থাকে।

দলের অধিকাংশ লোক তৎক্ষণাৎ সেইখান থেকেই বাড়ী ফিরে যাবার জন্যে ব্যাকুল দেখা গেল, কিন্তু ভবেশ ছাড়বার পাত্র নয়। নগেন্দ্র মেমোরিয়াল শিল্ডটা না নিয়ে যেন সে এখান থেকে বাড়ী ফিরবে না। কোন মতেই সকলকে বোঝাতে না পেরে সে চরম যুক্তি প্রয়োগ করলে। বাড়ী ত ফিরবে কিন্তু যাবে কি হেঁটে! সত্যিই ত! খোঁজ নিয়ে জানা গেল:রাত্তির আটটার আগে কোন ট্রেণ এই মাঠে আর থামছে না। অগত্যা উপায়ান্তর না দেখে আমাদের ভবেশের কথাতেই রাজি হতে হ'ল।

নসীপুরে কেমন করে পৌঁছোলাম ও সেখানে জলে জলময় মাঠে ওয়াটার পোলো ও রাগ্‌বির মাঝামাঝি কি ধরণের ফুটবল খেলা হ'ল তার আর বর্ণনায় কাজ নেই। নসীপুর আগমনের এই ভূমিকাটুকু সেরে আসল কথায় এবার নামা যাক্।

এগার জন মিলে খেলতে এসেছিলাম। খেলা-ধুলার নয়, খেলা-কাদার পর নসীপুর গ্রামের অবস্থা ও শিল্ডের কর্ম্মকর্ত্তাদের আতিথেয়তার নমুনা দেখে ছ'জন কিছুতেই আর থাকতে রাজি হ'ল না। বৃষ্টির ভেতর খাল বা রাস্তা সাঁৎরেই তারা ষ্টেশনে ফিরতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

সারাদিন বৃষ্টিতে ভিজে ও খেলায় কয়েকটা গোল খেয়ে আমরা একটু বেশী কাতর হয়ে পড়েছিলাম। এর ভেতর বসন্তর আবার একটু জ্বরভাবও দেখা দিয়েছে। জ্বর হওয়াটা আশ্চর্য্য নয়। কারণ ধাক্কাটা তার ওপর দিয়েই একটু বেশী গেছে। সেই ছিল গোলকীপার। জ্বর অবস্থায় বসন্তকে এই জলের

ভেতর ত যেতে দেওয়া যায় না। বসন্তর সঙ্গে ভবেশ, আমি, উদয় ও স্থরেন রাতটার মত নসীপুরেই কাটিয়ে দেব ঠিক করলাম।

ঠিক ত করলাম কিন্তু থাকব কোথায়! নগেন্দ্র মেমোরিয়াল শিল্ডের কর্ত্তা নগেনবাবু স্বয়ং আমাদের নিয়ে একটু ঘোরাফেরা করলেন। নগেন্দ্র মেমোরিয়া-লের কর্ত্তা নগেনবাবু স্বয়ং—শুনে একটু অবাক অনেকে হবে সন্দেহ নেই। আমরাও হয়েছিলাম। কিন্তু জিজ্ঞাসা করে জানলাম, নগেনবাবু নিজের নামটা বেঁচে থাকতে থাকতেই স্মরণীয় করে রেখে যেতে চান। পরে কে কি করবে বলা ত যায় না। শিল্ড তৈরীর খরচ যখন তিনিই দিয়েছেন তখন মেমোরিয়ালটা দু'দিন আগে থাকতে হ'লে কার কি বলবার আছে! যাই হোক, নগেনবাবু আমাদের নিয়ে একটু আধটু ঘোরাফেরা করেও স্থবিধে মত একটা থাকবার জায়গা খুঁজে পেলেন না। তাঁর নিজের বাড়ীতে আত্মীয়-স্বজন আসায় স্থানাভাব। পাড়ার অপর বাড়ীতে আতিথেয়তার আদর্শ একটু নীচু বলেই মনে হ'ল। নসীপুরে আরও একটি পাড়া আছে কিন্তু তাদের ওখানে শুনলাম ব্রজমোহন কাপ বলে আর একটি ফুটবল প্রতিযোগিতা খেলা হয়। নগেন্দ্র মেমোরিয়ালের সঙ্গে তাদের আদা এবং কাঁচকলার মত মধুর সম্পর্ক। এখানকার খেলুড়েদের তারা স্থান কিছুতেই দেবে না।

আশ্রয় পাওয়া সম্বন্ধে প্রায় হতাশ হয়ে উঠেছি, এমন সময় উদয়ের বুদ্ধিতে একটা স্থরাহা হয়ে গেল! গ্রামের একটি মাত্র চলন-সই রাস্তায় বার কয়েক আসা-যাওয়া করতে গিয়ে একটি মাত্র পাকা দোতালা বাড়ী সকলেরই চোখে পড়েছে। একটু ভগ্নদশা! কিন্তু আমাদের দশাত তার চেয়ে খারাপ!

উদয় হঠাৎ বলে ফেল্লে—"এ বাড়ীটার খোঁজ ত করেন নি মশাই! ওদেরও একটা শিল্ড বা কাপ আছে নাকি?"

নগেনবাবু হন হন করে হাঁটতে হাঁটতে বল্লেন—"না না মশাই,—ও বাড়ীর দিকে তাকাবেন না!"

তাঁকে একরকম জোর করে থামিয়ে বল্লাম—"কেন মশাই, দোষটা কিসের! একজন বিদেশী লোক জ্বরে পড়েছে শুনলেও এই বৃষ্টিবাদলার রাতে আশ্রয় দেবে না এমন চামার কেউ আছে নাকি!"

নগেনবাবু একটু রেগেই বল্লেন—"আরে না মশাই! গ্রেট বেঙ্গল স্পোর্টিং বারো গোল খেয়েছিল তাদেরই ওখানে থাকতে দিইনি, আপনারা ত মোটে আট গোল।"

সামান্য চারটে গোলের তফাতের দরুণ এমন আশ্রয় থেকে বঞ্চিত হ'তে হবে এ বড় অন্যায় কথা। সুরেন একটু ক্ষুণ্ণস্বরে বল্লে,—একটু চেষ্টা করলে আর চারটে গোল কি আমরাই খেতে পারতাম না!"

"আরে না মশাই, সে কথা নয়! চলুন চলুন!" কিন্তু আমরা অমন বাড়ীর লোভ ছেড়ে যেতে প্রস্তুত নই কিছুতেই। একবার জিজ্ঞেস করলে দোষ কি, এই আমাদের বক্তব্য।

নগেনবাবু চটে উঠে বল্লেন, "কাকে জিজ্ঞেস করবেন মশাই। ও বাড়ীতে কেউ থাকে!"

"থাকে না! তা'হলে ত আরো ভালো! একটা দরজা খোলা পেলেই হবে। নেহাৎ তালা ভাঙ্গতেই হয় ত দামটা না হয় দিয়েই দেব।"

নগেনবাবু আমাদের বিমূঢ় করে দিয়ে বল্লেন—"তালা নেই মশাই, দরজা সব খোলা!"

"দরজা খোলা, বাড়ীতে কেউ নেই, তবু এই বৃষ্টির ভেতর আমাদের ঘুরিয়ে মারছেন!"

"ঘুরিয়ে মারছি না আপনাদের, মারবার ইচ্ছে নেই বলেই ত ঘোরাচ্ছি।"

উদয়ের বুদ্ধিশুদ্ধি আমাদের চেয়ে একটু চট্ করে খোলে। সেই প্রথম ব্যাপারটা আন্দাজ করে বল্লে,—"ভূতুড়ে বাড়ী নাকি মশাই?"

নগেনবাবু মুখে কিছু না বলে শুধু একটু শিউরে উঠলেন।

ভবেশ হেসে উঠে বল্লে,—"এতক্ষণ বলতে হয়! ভূত পেলে কি এদেশে মানুষের আশ্রয় খুঁজি!"

নগেনবাবু গম্ভীর হয়ে উঠলেন অত্যন্ত—"ও বাড়ীতে থাকা হাসির কথা নয় মশাই!"

আমি বল্লাম—"বাড়ীর বাইরে থাকাও বিশেষ হাসির ব্যাপার মনে হচ্ছে না! আপনাকে আর কষ্ট করতে হবে না, আমরা ওখানেই চল্লাম। শুধু একটা হ্যারিকেন ও কটা মাতুর ও একজোড়া তাস যদি জোগাড় করে দিতে পারেন!"

নগেনবাবু তার পরেও আমাদের বাধা দেবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু আমরা নাছোড়বান্দা। অগত্যা অত্যন্ত হতাশ ও করুণভাবে আমাদের শেষ বিদায় দিয়ে ভবেশকে নিয়ে তিনি বাড়ী ফিরলেন। এ ভূতুড়ে বাড়ীতে রাত্তির বেলা জিনিষপত্র পৌঁছে দিতে আসতেও তিনি নারাজ!

বসন্তকে চাদর-টাদর মুড়ি দিয়ে নিয়ে আমরা ভূতুড়ে বাড়ীর দেউড়ির নীচে ভবেশের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলাম। ঝুপ ঝুপ করে সমানে বৃষ্টি পড়ছে। ঘুটঘুটে অন্ধকারে পাড়াগাঁয়ের পথে একটা আলোর রেখা দূরে থাক একটা জোনাকিরও দেখা নেই।

অনেক দিন বিনা ব্যবহারে পড়ে থাকার দরুণ বাড়ীটা থেকে কেমন একটা ভাপসা গন্ধ দেউড়ির তলাতেই পাচ্ছিলাম। গাঁয়ের লোক বাড়ীটা দেখে যে

ভয় পায় তাতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই। বাড়ীটা একেবারে গ্রামের এক ধারে। ধারে কাছে একটা বসতি নেই। দিনের বেলা বাড়ীর যে চেহারা দেখে গেছি, তা একটু অদ্ভুত। দোতালার একদিকের ঘরের জন্যে দেয়াল তোলার পর ছাদ আর সম্পূর্ণ হয়নি। ছাদহীন দেওয়ালগুলো দরজা-জানালার শূন্য ফোকর নিয়ে যে ভাবে দাঁড়িয়ে আছে, তাতে বাড়ীটার চেহারা সত্যিই কেমন যেন বদলে গেছে। বৃষ্টিতে অন্ধকারে বাড়ীটাকে এখন অবশ্য দেখা যাচ্ছিল না। কিন্তু কেমন একটা চাপা অস্বস্তির আবহাওয়া টের পাচ্ছিলাম।

ভবেশ একটা চাকরের মাথায় কিছু বিছানা চাপিয়ে হাতে একটা লণ্ঠন নিয়ে খানিক বাদে এসে হাজির হতে সত্যি খুশীই হলাম। চাকরটা আমাদের জিনিষপত্র দেউড়ির কাছে নামিয়ে দিয়েই যেভাবে পড়ি কি মরি করে দৌড় দিল তা একটা দেখবার জিনিষ !

নিজেরাই বিছানাপত্র ও লণ্ঠন নিয়ে এবার ভেতরের ভাঙা সিঁড়ি দিয়ে দোতালায় উঠলাম। দোতালার একদিকে গুটিকয়েক ঘর ঠিক আছে। সিঁড়ির সামনের প্রথম ঘরটিই বেশ বড়।

ঘরে ঢুকে লণ্ঠনটা তুলে ধরে ভবেশ অদ্ভুত সুর করে বললে—"কই বাপু ভূত, অতিথি-সজ্জন এল একটু সাড়া দাও।"

আমরা সকলে তার কথার সুরে শুধু নয়, সঙ্গে সঙ্গে আর একটা ব্যাপারেও হেসে উঠলাম। ভবেশের কথা শেষ হতে না হতেই ওধারের কোন ঘর থেকে লম্বা টানা ক্যাঁ—চ্ করে একটা শব্দ হ'ল! ভাঙা পুরোণ কোন জানালার পাল্লা বাতাসে নড়ার শব্দ নিশ্চয়, তবু শব্দটা ঠিক জুতসই ও যথাসময়ে হয়েছে বলতে হবে।

ভবেশ হেসে বল্লে,—"বেশ বেশ ! এইত ভদ্রতা, নসীপুর গ্রামে মানুষের চেয়ে ভূত ভালো !"

সঙ্গে সঙ্গে তার কথা সমর্থন করবার জন্যেই যেন পাশের ঘরে ঘড়্ঘড়্ ঝন্ঝন্ করে একটা আওয়াজ। একটু চমকে উঠলেও সবাই আবার হেসে ফেল্লাম। শুধু বসন্ত জ্বরের রুগী বলেই বোধ হয় একটু অপ্রসন্ন ভাবে বল্লে,— "ঠাট্টা-তামাসা আর ভাল লাগছে না বাপু! বিছানা টিছানা একটা করতে হয় ত করো।"

সুরেন ও উদয়কে বিছানা পাতবার ভার দিয়ে আমি ও ভবেশ একবার পাশের ঘরে দেখতে গেলাম, ব্যাপারটা কি !

ভবেশ বল্লে,—"সাড়া-টাড়া দিচ্ছেন যখন, সশরীরে একবার দেখা দেন কিনা দেখাই যাক না !"

পাশের ঘরটা আকারে ছোট। দেয়াল থেকে নোনা ধরা চূণ-বালি খসে পড়ে ও পুরোণ কাঠ-কাঠরার ভগ্নাংশ থাকার দরুণ অত্যন্ত নোংরা।

ঘরে ঢুকেই তু'জনেই অমন চমকে উঠব ভাবিনি।

বাতিটা ছিল ভবেশের হাতে পেছনে। দরজার গোড়ায় পা দিতে না দিতেই অন্ধকারে কাপড় টেনে ছিঁড়ে ফেলার মত ফ্যাঁস্ করে একটা আওয়াজ শুনে সত্যি শিউরে উঠলাম নিজের অনিচ্ছায়। পেছন থেকে ভবেশও সেটা শুনতে পেয়েছিল, বাতিটা নিয়ে এগিয়ে এসে বল্লে,—"শুধু তোমার বাণী নয় বন্ধু, একটু দর্শনও দিও! কই তিনি ?"

এবার তাঁকে দেখা গেল চাক্ষুষ। দেখে ভয় পাবারই কথা। অতবড় এবং অমন মিশকালো বেড়াল বাংলা মুলুকে জন্মায় বলে জানা ছিল না। তিনি তার বহুদিনের দখলি সত্ত্বের ওপর আমাদের চড়াও হওয়াটা অন্যায়

উপদ্রব মনে করে জ্বলজ্বলে চোখে গায়ের লোম ফুলিয়ে এখন দন্তবিকাশ করছিলেন।

ভবেশ বাতিটা নামিয়ে হতাশার ভঙ্গিতে বল্লে,—"এটা কি ভালো হ'ল প্রভু! এত আশ্বাস দিয়ে শেষকালে বেড়ালরূপ ধারণ করলেন। আপনার নিজমূর্ত্তি কই!"

বেড়ালটা আর একবার ফ্যাঁস করে উঠল উত্তরে, ও আমরা হেসে ফেল্লাম। পেছনের ঘর থেকে বসন্তর বিরক্ত গলা শোনা গেল—"আবার বাতিটা নিয়ে গেলি কোথায়—অন্ধকারেই থাকব নাকি!"

সে ঘরে ফিরে ভবেশ হেসে বল্লে,—"তোর কি ভয় করছে নাকি! না জ্বরের লক্ষণ!"

বসন্ত আরো যেন বিরক্ত হয়ে বল্লে,—"ভয় টয় জানি না বাপু! আমার ভাল লাগছে না। খুঁজে খুঁজে আচ্ছা থাকবার জায়গা বার করেছ!"

আমরা সবাই মিলে তাকে অবশ্য ঠাট্টায় নাকাল করে তুললাম, কিন্তু তা সত্ত্বেও মনে হচ্ছিল, অস্বস্তি একা বসন্তরই হয়নি।

সামনে দীর্ঘ রাত। খাবার-দাবার নগেনবাবু চাকরের সঙ্গে যা পাঠিয়েছিলেন, তার সৎকার করে বসন্তকে একটা বিছানায় শুতে বলে আমরা আর একটায় তাস খেলতে বসলাম। কেন বলা যায় না, সমস্ত বৃষ্টিতে ভিজে ও ফুটবল খেলে ক্লান্ত হ'লেও ঘুমোবার জন্যে শুতে কেউ তেমন ব্যাকুল নয় দেখা গেল।

রাত্রের সঙ্গে বৃষ্টির বেগও ক্রমশঃ যেন বাড়তে লাগল। সেই সঙ্গে পুরাণ বাড়ীর দরজা, জানালার নানারকম আওয়াজ ক্ষণে ক্ষণে।

তাস খেলাটা তার মাঝে কিছুতেই যেন জমল না। এক সময়ে সবাই তাস ফেলে দিলাম। সুরেন বল্লে,—"এবার শুয়ে পড়লে হয়!" আমরা সবাই সায় দিলাম, কিন্তু কারুর ওঠবার নাম নেই!

হঠাৎ ভবেশ বল্লে,—"সাধারণ লোক কেন ভয় পায় বুঝেছ ত। কি রকম আওয়াজটা হচ্ছে শুনছ! কে বলবে যে, ও ঘরে একটা কাঠের পা ঠকঠকিয়ে কেউ হেঁটে বেড়াচ্ছে না?"

আওয়াজটা আমরা সবাই শুনেছিলাম। এই প্রথম নয় এর আগেও অনেকবার, কিন্তু মুখ ফুটে কেউ কিছুই বলিনি।

ভবেশ আবার বল্লে—"এসব থেকেই মানুষ ভূত তৈরী করে"।

ভবেশের কথা শেষ না হতেই, উদয় বল্লে,—"তা না হয় হ'ল, কিন্তু অমন আওয়াজটাই বা কিসের! ও ত আর জানালা নড়ার শব্দ নয়!"

আমরা পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করলাম একবার। সকলেই একটু যেন হতভম্ব। হঠাৎ সুরেন লণ্ঠনটা নিয়ে উঠে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে আমরাও উঠে পাশের ঘরে গিয়ে হাজির হ'লাম। কই কোথাও কিছু নেই ত!

ভবেশ হেসে উঠ্ল,—"আমাদেরও ভয় ধরল নাকি!" তার হাসিটা খুব আন্তরিক শোনাল না!

উদয় হঠাৎ চাপা উত্তেজিত কণ্ঠে বল্লে,—"কিন্তু ওটা কি!"

আমাদের সকলের দৃষ্টি তখন সেদিকে পড়েছে। আমি গিয়ে সেটা হাত দিয়ে তুলে ধরলাম,—একটা কালো রঙের খানিকটা ছেঁড়া কাপড়!

হেসে বল্লাম—"রজ্জুতে সর্প ভ্রম হচ্ছে নাকি!"

এবার ভবেশই বল্লে—"কিন্তু বেড়ালটা কোথায় গেল? ওইখানেই দেখেছিলাম না!"

তাও ত ঠিক! বেড়ালটাকে ত এইখানেই দেখা গেছল। এই কাপড়টাকে ভুল করে কি…না, তাও সম্ভব নয়, স্পষ্ট তাকে দেখেছি, রাগের ফোঁসফোঁসানি শুনেছি নিজের কাণে!

তবু হেসে বল্লাম—"বেড়াল কি তোমার জন্যে এতক্ষণ বসে আছে! সে কখন সরে পড়েছে!"

"কিন্তু কোথা দিয়ে! এ ঘরের একটি মাত্র জানালা তাও বন্ধ। ওধারের দরজায় খিল দেওয়া ত দেখতেই পাচ্ছ!"

বল্লাম—"আমাদের ঘর দিয়েই পালিয়েছে হয়ত!" মুখে বল্লেও মনের খট্‌কা গেল না। আমাদের ঘর দিয়ে কোন বেড়ালের পক্ষে আমাদের অজান্তে যাওয়া সম্ভব ত নয়। একেবারে দরজার সামনেই আমরা তাসের আসর পেতে বসেছিলাম। একটা ধুম্‌সো মিশকালো বেড়াল পেরিয়ে গেলে জানতে পারব না এমন বেহুঁস আমরা ছিলাম কি?

ভবেশ বল্লে,—"থাকগে, বেড়ালের অন্তর্দ্ধান তত্ত্ব নিয়ে মাথা ঘামাতে আর…" তার মুখের কথা মুখেই রয়ে গেল। আমাদের সকলের শিরদাঁড়া বেয়ে একটা বরফ গলানো জলের স্রোত নেমে গেল বিদ্যুৎ বেগে!

ওধারের ঘরে বসন্তর সে কি আতঙ্কের চীৎকার! উত্তেজনার মুখে আমরা সবাই তাকে অন্ধকারে একলা ফেলে এসেছি!

ছুটে সবাই এ ঘরে এলাম। বসন্ত ছাইএর মত মুখ করে উঠে বসেছে! তার কপাল মুখ অসম্ভব রকম ঘেমে উঠেছে!

"হয়েছে কি! কি হ'ল!"

বসন্ত হাঁফাবে না কথা বলবে! অনেক কষ্টে থেমে থেমে যা বল্লে, তার মর্ম্ম—তার মাথার কাছে বসে কে যেন বরফের মত ঠাণ্ডা নিশ্বাস তার মুখে ফেলছিল।

আমরা সবাই হেসে উঠলাম জোর করে! "জ্বরের ঘোরে তুই দুঃস্বপ্ন দেখেছিস।"

বসন্ত তীব্রভাবে প্রতিবাদ করে বল্লে—"না না, আমি জেগে স্পষ্ট সে নিশ্বাস শুনেছি, মুখের ওপর টের পেয়েছি অনেকক্ষণ, তারপর চীৎকার করেছি! তোরা ওরকম করে চলে যাসনি।"

ভবেশ হাসবার চেষ্টা করে বল্লে—"আচ্ছা, আচ্ছা তাই হবে। এমন ভয়কাতুরে ছেলেও দেখিনি। আমরা এখানেই শুচ্ছি এবার!"

উদয় একটু ইতস্ততঃ করে বল্লে,—"এক্ষুণি শুয়ে কি দরকার! জেগে একটু গল্প করা যাক্ না!"

ক্লান্তিতে শরীর ভেঙে পড়লেও কারুর সে কথায় আপত্তি দেখা গেল না, ভবেশেরও না।

"বেশ ত!" ভবেশ বল্লে,—'কিসের গল্প হবে! বল, সুরেন একটা ভূতের গল্পই বল, এবাড়ীতে বেশ লাগবে।"

বসন্ত তাড়াতাড়ি বল্লে—"না, না!"

"যাঃ তুই একেবারে ভীতুর একশেষ! বল সুরেন!"

সুরেন ম্লানভাবে একটু হেসে বল্লে,—"বলব তাহলে শোন! আন্‌বিটন ইলেভন বলে এক টীম গেছল নসীপুরে...."

আমরা সবাই একটু হাসলাম। ভবেশ বল্লে—"আহা বলতেই দাও ওকে!"

সুরেন বলতে সুরু করলে,—আমাদের নসীপুর আসা ও তারপরের ঘটনার সে যা বর্ণনা দিলে, তাতে অন্য সময় হ'লে হাসিত নিশ্চয়, কিন্তু ঘরে এখন সাড়াশব্দ বিশেষ নেই। গল্প শেষে ভূতুড়ে বাড়ী পর্য্যন্ত এসে পৌছল, সেখানকার ঘটনাগুলো একে একে শেষ করে সুরেন বল্লে,—ঘুটঘুটে অন্ধকার রাত, বাইরে বৃষ্টির অবিশ্রান্ত শব্দ, আরো নানারকম বিদঘুটে আওয়াজ! ঘরে লণ্ঠনের মিটমিটে আলোয় একজন গল্প বলছে ভূতের গল্প।

কেউ সে গল্পে বিশ্বাস করে না, গল্প যে বলছে সে হঠাৎ একটা তাস নিয়ে ওপরে ছুড়ে দিয়ে বল্লে, "অশরীরী কেউ এখানে থাকে ত এ তাস বাতাসে মিলিয়ে যাক্!"

হাসতে গিয়ে আমরা স্তব্ধ হয়ে গেলাম।

উদয় বল্লে,—"আরে তাসটা পড়ল কোথায় ?"

সুরেন সত্যি সত্যিই গল্পের সঙ্গে একটা তাস ওপরে ছুড়ে দিল।

ভবেশ তাচ্ছিল্যের সুরে বলবার চেষ্টা করলে—"পড়েছে কোথাও ওদিকে !"

"ওদিকে কোথায় !" উদয়ের গলার স্বর তীক্ষ্ণ !—"ওদিকে ত খালি মেঝে। এ ঘরে ত জিনিষ লুকিয়ে থাকবার মত জায়গা নেই।"

আমি তবু উঠে বসন্তর বিছানার আশপাশ সমস্ত ভাল করে খুঁজলাম। অন্য সবাইও তন্ন তন্ন করে সমস্ত ঘর খুঁজে দেখল।

আশ্চর্য্য ! আমাদের সকলের মুখ গম্ভীর। শুধু বসন্তর নয়, আমাদের কপালেও ঘাম দেখা দিয়েছে।

ভবেশ হঠাৎ অকারণে অত্যন্ত রেগে উঠে বল্লে,—"কি তোমরা যা তা করছ ! পাগল হ'লে নাকি সবাই ! নাও সুরেন গল্প বলো।"

শুকনো পাংশু মুখে আমরা যন্ত্র-চালিতের মত আবার এসে বসলাম। সুরেনের মুখে যেন রক্ত নেই। সকলের মুখের দিকে চেয়ে সে আবার একটা তাস তুলে নিলে, তারপর বল্লে,—"আগের তাসটা উড়ে গেল..."

ভবেশ শুধু বল্লে—"হুঁ।"

"আবার একটা তাস নিয়ে গল্পের কথক বল্লে,—"উড়ে যাওয়াটা প্রমাণ নয় !"—সুরেনের স্বর অত্যন্ত অস্ফুট—"এবারের তাস থেকে একটা মস্ত কালো বেড়াল বেরিয়ে...."

বসন্তর চীৎকার বুঝি সকলের ওপরে শোনা গেল। তার বিছানায় ঠিক পায়ের কাছে...

না, সেবার আমরা অক্ষত দেহেই তার পরদিন কলকাতায় ফিরেছিলাম। শুধু বসন্তর জ্বরটা বিকারে দাঁড়িয়েছিল কলকাতায় এসে। বেচারাকে ভুগতে হয়েছিল অনেক দিন।
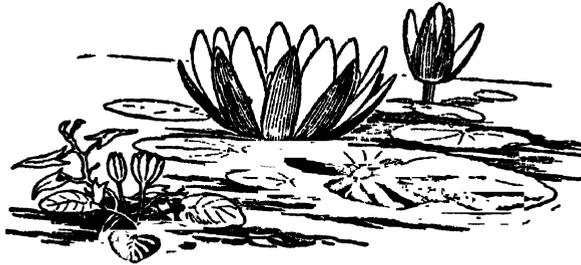
—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র দাশগুপ্ত

তখন হলদীঘাটের গিরি-সঙ্কটে রক্তের যে হোরী খেলা আরম্ভ হইয়াছিল তাহা শেষ হইয়া যায় নাই,— তখনও অস্ত্রের ঝন্‌ঝনা, অগ্নিনালিকার মুহুর্মুহু গর্জ্জন, আর আহতের আর্ত্তনাদ সব একসঙ্গে মিলিয়া মৃত্যুদূতের ঐক্যতান

বাদ্য বাজাইতেছিল। দিবসের আলো ম্লান হইয়া আসিয়াছে, কিন্তু সায়াহ্ন সূর্য্য আরাবল্লীর শিখরে শিখরে তাঁহার আরক্ত কিরণ-সম্পাতে স্বাধীনতার যে শেষ আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করিতেছিলেন তাহা তখনও সম্পূর্ণ মিলাইয়া যায় নাই।

দিবসের এই সন্ধিক্ষণে অগণিত আততায়ীর দুর্ভেদ্য ব্যূহ ভেদ করিয়া জীবন-মরণের সন্ধি ক্ষেত্র হইতে বীর প্রতাপ তাঁহার প্রিয়তম অশ্ব চৈতককে ঝড়ের বেগে চালিত করিয়া ছুটিয়াছেন,—লৌহবর্ম্ম ভেদ করিয়া রক্তের ফিন্‌কি ছুটিতেছে, ললাটের ঘর্ম্ম গলিয়া পড়িয়া অঙ্গরাখাকে সিক্ত করিতেছে,—ভ্রূক্ষেপ নাই।

মাত্র বাইশ হাজার মৃত্যুভয়হীন দেশপ্রেমিক আত্মোৎসর্গকারিগণকে লইয়া প্রতাপ বিরাট মোগল অক্ষৌহিণীর বিরুদ্ধে দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সংগ্রামে নামিয়াছিলেন, আজ তাঁহাদের মধ্যে চতুর্দ্দশ সহস্রকে হলদীঘাটের রক্ত-কর্দ্দমের মধ্যে সমাধি দিয়া তিনি নিঃসঙ্গ ছুটিয়া চলিয়াছেন। এখনও তাঁহার ব্রত উদ্‌যাপন হয় নাই,—এখনও তাঁহার সচেতন কর্ণে আশার মোহনবেণু স্বাধীনতার সাহানা রাগিণী ধ্বনিত করিতেছে;—তিনি ছুটিয়াছেন আবার মেবারের হতাবশিষ্ট রাজপুতগণকে দেশপ্রেমের প্রাণরসে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিবার জন্য।

অনুসরণকারী খোর্‌সানী ও মুলতানী মোগল সৈনিকদ্বয়ের অশ্বক্ষুরধ্বনি ক্রমশঃ নিকটবর্ত্তী হইতেছে। তীব্র কটাক্ষে প্রতাপ একবার পশ্চাতে ফিরিয়া চাহিলেন, তারপর বল্গা সজোরে আকর্ষণ করিয়া অশ্ব চৈতককে দ্রুতবেগে চালাইয়া দিলেন।...এঁ্যা! সর্ব্বনাশ!—সম্মুখে খরস্রোতা গিরিতরঙ্গিণী আরাবল্লীর উপত্যকা কাটিয়া বহিয়া যাইতেছে। কি করিয়া এই শৈবালে, শাদ্বলে সমাচ্ছন্ন বেগবতী স্রোতস্বিনী অতিক্রম করা যায়?—প্রতাপের উদার ললাটে

চিন্তার দুই একটা ক্ষীণ রেখা মুহূর্ত্তে টানিয়া গেল। কিন্তু কি অপূর্ব্ব শিক্ষা, কি অসীম সাহস চৈতকের!—চোখের পলক না ফেলিতেই সে এক লম্ফেই

তটিনী পার হইয়া ছুটিতে লাগিল। প্রভুর মত তাহারও সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত —যে সামর্থ্যটুকু লইয়া সে এতক্ষণ সবেগে ছুটিতেছিল তাহা প্রতি পাদক্ষেপে ক্ষয় হইয়া আসিতেছে।

খোর্‌সানী ও মুলতানী সৈনিকদ্বয়ের গতিবেগ তটিনীর তীরে আসিয়া একটু বাধা পাইয়াছিল বটে, কিন্তু তটিনী অতিক্রম করিয়া তাহারা আবার

তাহাদের তেজস্বী অশ্বদ্বয়কে পূর্ণ বেগে চালিত করিয়া ছুটিয়া আসিতেছে। প্রতাপের উৎকর্ণ কর্ণযুগল ক্ষণে ক্ষণে উৎকণ্ঠিত হইয়া তাহাদের বলিষ্ঠ পাদক্ষেপের ধ্বনি শুনিতে লাগিল।

গুড়ুম—গুড়ুম!—হঠাৎ অগ্নিস্ফুলিঙ্গ চমকিত করিয়া বন্দুকের শব্দ হইতে লাগিল, সচকিত প্রতাপ বিস্মিত নয়ন তুলিয়া পশ্চাতে ফিরিয়া চাহিলেন,—তখন সন্ধ্যার শ্যামিকায় আকাশের আরক্ত আভা ফিকা হইয়া উঠিয়াছে। দুই একবার শুধু অগ্নি-শিখার ক্ষণিক চমক ভিন্ন কিছুই তিনি দেখিতে পাইলেন না, তবে তাঁহার অনুসরণকারীদের অশ্বক্ষুরধ্বনি যে হঠাৎ থামিয়া গেল তাহা বুঝিতে পারিলেন। ব্যাপার কি ঠিক অনুমান করিবার পূর্ব্বে,—তাঁহার মনের বিস্ময় না ভাঙ্গিতেই সহসা মেওয়ারী ভাষায় তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া কে যেন ডাকিয়া উঠিল,—

"হো, নীল ঘোড়েকা আসোয়ার—"

প্রতাপের প্রিয় অশ্ব চৈতক নিতান্ত শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে, তাহার মুখের বল্গা-রশ্মি আচ্ছন্ন করিয়া অনবরত মুখ দিয়া ফেন নির্গত হইতেছে। প্রতাপ রশ্মি শ্লথ করিয়া অশ্বের গতিবেগ একটুকু মন্থর করিলেন। পশ্চাতে একবার ফিরিয়া চাহিতেই দেখিতে পাইলেন,—তাঁহার অভিশপ্ত ভাই,—মোগলপদাশ্রিত শক্ত সিংহ, বন্দুকে লক্ষ্য স্থির করিয়া, অশ্ব ছুটাইয়া তাঁহারই দিকে দ্রুতবেগে অগ্রসর হইতেছে।

তীব্র বেদনায় প্রতাপের চোখ-মুখ ঐ ধূমাচ্ছন্ন আসন্ন রাত্রির মলিন আভার মত ম্লান হইয়া উঠিল, অতীতের স্মৃতির জ্বালা বৃশ্চিকের দংশন জ্বালার মত তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপিয়া ব্যাপ্ত হইতে লাগিল।—কাহার সম্মান, কাহার স্বাধীনতার জন্য তিনি এই দুঃখ বরণ করিয়া নিয়াছেন?—কোথায় তাঁহার রাজসৌভাগ্য সম্ভোগ?—কোথায় শত সুখস্মৃতি জড়িত শ্যামল মেবার,—কোথায় পুষ্পবিভূষণা

স্বর্গাদপি গরীয়সী জননী জন্মভূমি? কাহার জন্য তিনি বন হতে বনান্তরে প্রতাড়িত হইয়া তাঁহার দীপ্ত যৌবনের উপর দুঃখ, দারিদ্র্যের বিষণ্ণতা টানিয়া আনিয়াছেন? অম্বর, মারাবার, বিকানীর,—যাঁহাদের যশোজ্যোতিঃ নিদাঘের প্রচণ্ড ভাস্কর-কিরণ ম্লান করিয়া দিত, আজ তাঁহাদের সে মহিমাময় শিরগুলি মোগল মসনদের তলে ধূলায় লুণ্ঠিত,—কেহ ভগ্নী কেহ কন্যা মোগল বাদশা বা বাদশাজাদার করে তুলিয়া দিয়া তাঁহাদেরই প্রদত্ত অনুগ্রহের মুষ্টিভিক্ষায় করপুট পূর্ণ করিয়া নতশিরে দিল্লীর সিংহাসন সম্মুখে দণ্ডায়মান। এক রক্তের উত্তরাধিকারী তাঁহারই সহোদর ভাই শক্ত সিংহও আজ জঘন্য জিঘাংসা বৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য মোগলের নিকট হইতে বন্দুক ভাড়া করিয়া তাঁহার মস্তক লক্ষ্য করিয়া ছুটিয়া আসিতেছে। বীর নিজেকে আর সংযত রাখিতে পারিতেছিলেন না। তাঁহার কপোল সিক্ত করিয়া অশ্রুধারা বহিতে লাগিল। চিতোর, মেবারের সান্ধ্যদীপ নির্ব্বাপিত করিয়া, যিনি সারা দেশকে সম্পূর্ণ "বে-চেরাগ" করিয়া রাখিয়াছেন, নির্ম্মল সলিলা বুনাস নদীর উর্ব্বর তীরভূমিকে যিনি কণ্টকী বনে পরিণত করিয়াছেন, মেবারের প্রতি পরিজনকে যিনি কঠোর আদেশে গৃহত্যাগী করিয়া বনে পাঠাইয়া মেবারকে জনমানবহীন একটা ভয়াবহ প্রেতভূমির স্তব্ধতার মধ্যে নিয়া আসিয়াছেন,—তাঁহার এ কূট কৌশল কি আজ দিবসের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে নিঃশেষ হইয়া যাইবে? নিজে হাতে গড়া মেবারের ঐ শ্মশানে তিনি কি আর কখনও পুষ্পোদ্যান রচনা করিতে পারিবেন না?

হতাশায় তিনি যখন উন্মাদের মত দিক্-চক্রবালে একটা ক্ষীণ আলোক-রশ্মির সন্ধানে উদ্‌ভ্রান্ত নয়নে চাহিলেন তখন তাঁহাকে মুগ্ধবিস্ময়ে অভিভূত করিয়া, শক্ত সিংহ অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া "দাদা" "দাদা" বলিয়া মধুর সম্বোধনে তাঁহার চরণে লুটাইয়া পড়িল। ভাবের আবেগে প্রতাপের দৃঢ় সম্বদ্ধ

অধর স্নেহের শত আবাহনে ভাইকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য কাঁপিতে লাগিল, অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কিন্তু কোন কথাই উচ্চারণ করিতে পারিলেন না শুধু কয়েক ফোঁটা কৃতজ্ঞতার অশ্রুতে ভাইয়ের মস্তক অভিষিক্ত করিয়া তিনি শক্তকে বুকে জড়াইয়া রাখিলেন! বহুদিন পরে আজ দুইটি বিচ্ছিন্ন ভ্রাতৃ-হৃদয় আবার স্নেহের মধুর নিগড়ে বদ্ধ হইয়া গেল।

পর্ব্বত অধিত্যকার সে অনাবৃত অম্বর তলে,—স্নেহ, ভালবাসার সে বীভৎস শ্মশানের সে নেপথ্যে যখন দুইটি ভাইয়ের হৃদয় মধ্যে প্রেমতীর্থের ত্রিবেণী ধারা প্রবাহিত হইতেছিল তখন একটা নিতান্ত শোকাবহ দুর্ঘটনা তাঁহাদের সম্মুখে ঘটিয়া গেল।—প্রতাপের প্রিয়তম অশ্ব 'চৈতক' তাহার বিস্ফারিত নাসারন্ধ্র দিয়া দুই একবার নিশ্বাস পতনের বিকট শব্দ তুলিয়া চিরদিনের জন্য চক্ষু মুদ্রিত করিল।

প্রতাপ কতক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে তাঁহার প্রিয় তুরঙ্গমের পানে চাহিয়া রহিলেন, তাঁহার নয়ন দু'টি অশ্রুতে ভরিয়া উঠিল। করযুগল স্নেহেতে কাণায় কাণায় পূর্ণ করিয়া স্নেহাস্পদ চৈতকের মৃত্যুহিম অঙ্গে বুলাইয়া দিয়া তাঁহার অন্তরের গভীর কৃতজ্ঞতার শেষ অর্ঘ্য অর্পণ করিলেন।

তখন সন্ধ্যার সমস্ত সৌন্দর্য্য লুপ্ত করিয়া রাত্রির অন্ধকার ঘনাইয়া উঠিয়াছে, শক্ত সিংহ তাঁহার ঘোড়াটির উপর প্রতাপকে তুলিয়া দিয়া মুলতানী সৈনিকের অশ্বটিতে নিজে চড়িয়া মোগল শিবিরে ফিরিয়া গেলেন।

*

বাদশাজাদা সেলিমের শিবিরে তখন বিজয়ের আনন্দোৎসব আরম্ভ হইয়াছে। অসংখ্য দীপালির রোশনাইয়ে আশমানের তারাগুলি নিষ্প্রভ হইয়া উঠিয়াছে, সৈন্য-সামন্তেরা সকলেই সফলতার গর্ব্বে বুক ফুলাইয়া

বাদশাজাদাকে বেষ্টন করিয়া বসিয়াছে। শক্ত সিংহের প্রতাপকে অনুসরণ করিবার সংবাদ সেলিম জানিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার দীর্ঘ অনুপস্থিতিতে সেলিমের মন নানা সন্দেহে তোলাপাড়া করিতেছিল। তিনি যখন নিকটস্থ উজীরের সঙ্গে এই সম্পর্কে আলাপ করিতেছিলেন তখন শক্ত সিংহ হঠাৎ কুর্ণিশ করিয়া তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

শক্তের চোখে মুখে উদ্বেগের যে একটা বিষাদ-মলিন ছাপিয়া গিয়াছে তাহা সেলিমের চোখ এড়াইল না। তিনি শক্তকে তাঁহার অনুপস্থিতির কারণ একটু কঠিন কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন।

শক্ত সিংহ প্রথমে নানা ছলনাপূর্ণ বাক্যে সেলিমকে ভুলাইতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সেলিম শক্তের এ প্রতারণা ধরিয়া ফেলিলেন। শক্তের কোন কথা তিনি প্রত্যয় করিলেন না, অবশেষে শক্তের নিতান্ত বিহ্বল অবস্থা দেখিয়া তাঁহাকে অভয় দিয়া সেলিম বলিলেন,—

"তুমি যদি সত্য কথা বল শক্ত, আমা হইতে তোমার কোন অনিষ্ট হইবে না।"

অভয় পাইয়া শক্ত সিংহ নিতান্ত আবেগপূর্ণ স্বরে হাত দু'টি যুক্ত করিয়া বলিতে লাগিলেন,—

"বাদশাজাদা! আপনি মহানুভব। আমায় ক্ষমা করুন জনাব! আমি মোগলের বিরুদ্ধাচরণ করেছি।"

সেলিম জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি করেছ? কেন করলে?"

"পারলেম না জনাব! হলদীঘাটের ভয়াবহ যুদ্ধক্ষেত্রে দাদা প্রতাপের শৌর্য্য দেখে নিজেকে আর স্থির রাখতে পারলেম না।—লবণাম্বু অনন্ত সাগর বুকে একটা ক্ষণিকের গরিমায় সূর্য্যোদয় যেমন সিন্ধুর বিশাল উদারতা, তার ফেন বিভঙ্গ ভৈরব তরঙ্গোচ্ছ্বাস, তার সমস্ত মহিমাকে পশ্চাতে রেখে আপনার

দীপ্ত গৌরবে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে,—প্রতাপের লোকাতীত অপূর্ব্ব শৌর্য্যও প্রভাতের প্রোজ্জ্বল ভাস্করের মত মোগল অক্ষৌহিণীর উত্তাল তরঙ্গ বক্ষে মোগলের সমস্ত পৌরুষকে মলিন করে প্রকট হয়ে উঠেছিল।—উদ্যত অসি কোষবদ্ধ করে মুগ্ধবিস্ময়ে নয়ন বিস্ফারিত করে এই অলৌকিক শৌর্য্যের পানে চেয়ে রইলেম ; – ধিক্কারে, গ্লানিতে নিজেকে শতবার পীড়িত করে তারপর ছুটে চল্লেম দাদার চরণে লুটাবার জন্য।—পথে দেখি খোর্‌সানী, মুলতানী সৈনিকদ্বয় শাণিত বর্ষা উদ্যত করে দাদার মস্তক লক্ষ্য করে ছুটেছে। হস্তে যে গুলিভরা বন্দুক ছিল, অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা না করে তার ঘোড়া টিপলাম,—খোর্‌সানী, মুলতানীর মৃতদেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।—একটা দেশের সম্মান, একটা জাতির সম্মান,—রাজপুতনার স্বাধীনতা একমাত্র দাদা প্রতাপের পানে দীন নয়নে চেয়ে আছে,—আজ রাজপুতনার প্রায় সমস্ত শিরগুলি মোগলের চরণধূলির রাজটীকায় কলঙ্কিত, একমাত্র প্রতাপের প্রশস্ত ললাটে স্বাধীনতার পুণ্যরশ্মি অম্লান জ্যোতিতে উজ্জ্বল হয়ে আছে। তাঁর এ অমূল্য জীবন রক্ষা না করে থাকতে পারলেম্ না জনাব !”

কথা শেষ করিয়া শক্ত সিংহ ভাবাবেগে কাঁপিতে লাগিলেন।

সেলিম রুদ্ধ নিশ্বাসে সমস্ত শুনিলেন। তাঁহার সুন্দর নয়ন প্রান্তে প্রতিহিংসার একটা ক্ষীণ বক্র রেখাও টানিয়া গেল না। তিনি ধীর, সংযত ভাষায় শক্ত সিংহকে মোগলের আশ্রয় পরিত্যাগ করিতে আদেশ করিলেন।

দাসত্বের সমস্ত গ্লানি, সুখ, স্বাচ্ছন্দ্যের সমস্ত মোহ সবলে ঝাড়িয়া ফেলিয়া শক্ত সিংহ ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ পথের মধ্য দিয়া তাঁহার হারানো স্নেহের বুকে,—প্রতাপের কোলে ফিরিয়া আসিলেন।
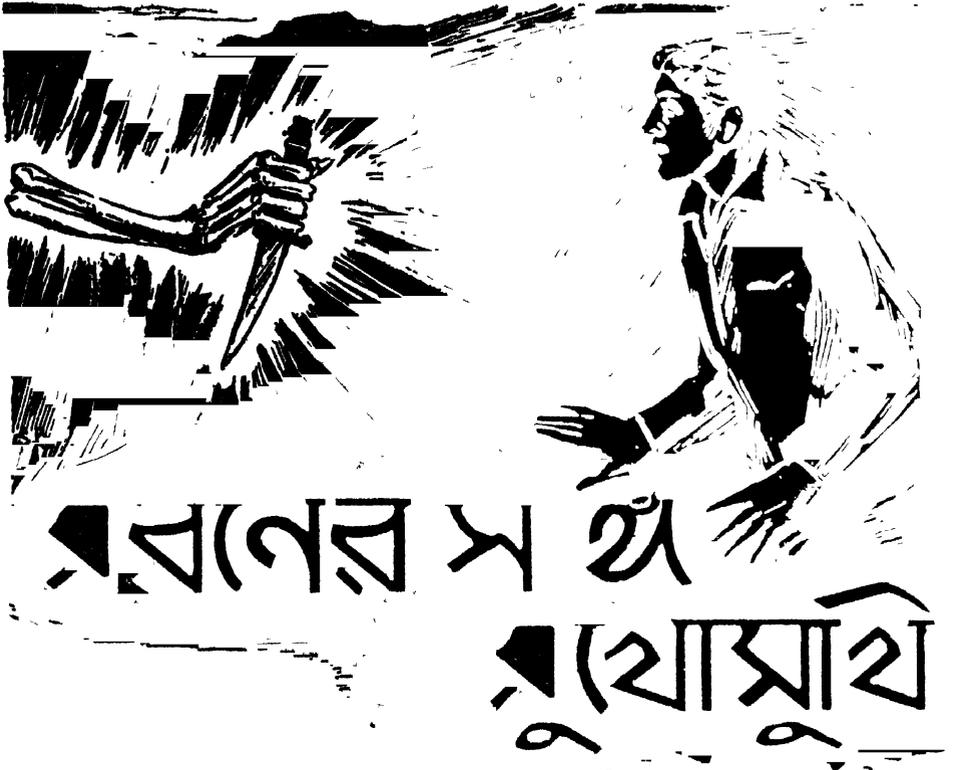
—শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর

সেদিনকার খবরের কাগজে একটা খবর ছাপা হয়েছিল ঃ—

ভৌতিক বাড়ী।

ভূতের উপদ্রবে ভাড়াটিয়ার মৃত্যু।

গত রবিবার রাত্রে বালিগঞ্জের কসবা অঞ্চলে বিজয়বাবু রোডে একটী বাড়ীর জনৈক ভাড়াটিয়ার আকস্মিক মৃত্যু ঘটিয়াছে। ভদ্রলোক সেই দিনই

সকালে সপরিবারে নূতন ভাড়া আসিয়াছিলেন। রাত্রি বারোটার সময় সহসা সেই বাড়ী হইতে মহিলা কণ্ঠের চীৎকার শোনা যায়। চীৎকার শুনিয়া প্রতিবেশীরা বাহিরে আসিয়া দেখেন, ভদ্রলোকের স্ত্রী ও চাকর বাড়ীর বাহিরে দাঁড়াইয়া থর্‌থর্ করিয়া কাঁপিতেছেন। ভদ্রলোকের কি হইল খোঁজ করিতে গিয়া প্রতিবেশীরা বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিয়া দেখেন, দরজার কাছে ভদ্রলোক পড়িয়া আছেন। প্রথমে অজ্ঞান বলিয়া মনে হইয়াছিল, পরে ডাক্তারী পরীক্ষায় জানা যায়, হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ায় ভদ্রলোকের মৃত্যু ঘটিয়াছে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, সহসা মৃদু ঘণ্টার শব্দ শুনিয়া সকলের ঘুম ভাঙিয়া যায়, ব্যাপার কি দেখিবার জন্য ঘরের বাহিরে আসিয়া জীবনবাবু (ভাড়াটিয়ার নাম) দেখিতে পান একটি জ্বলন্ত হাত একখানি ছোরা লইয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিতে আসিতেছে। তিনি ভয়ে পলাইতে গিয়া পড়িয়া যান, তাঁহার স্ত্রী ও চাকর কোনও রকমে বাহির হইয়া পড়ে।

এই প্রসঙ্গে পাঠকদের স্মরণ থাকিতে পারে যে, কিছুদিন আগে পরপর দু'জন ভাড়াটিয়া এই বাড়ীতে ভয় দেখে। একজনের এই জীবনবাবুর মতই মৃত্যু ঘটে, আরেকজন বারান্দা থেকে পথের উপর লাফাইয়া পড়িয়া কোনও রকমে রক্ষা পান। এই বাড়ীটি এই অঞ্চলে ভূতুড়ে বাড়ী বলিয়া প্রসিদ্ধ, জীবনবাবু ইহা জানিয়াও ভাড়া লইয়াছিলেন।

পুলিশ ঘটনার তদন্ত করিতেছে।

খবরটা পড়েই সরোজ বললে—চল, আজ রাত্রে ভূতের সঙ্গে খানিক আলাপ করে আসি—

ডেভিড্ বললে—নিশ্চয়, চুপ করে বসে থেকে থেকে হাতে পায়ে ঘুণ ধরে যাচ্ছে—

রাত তখন দশটা। দু'বন্ধু ভূতুড়ে বাড়ীর সামনে এসে দাঁড়ালো—সমস্ত বাড়ীখানি অন্ধকারে থম্‌থম্ করছে। চারিপাশ একবার ভাল করে দেখে নিয়ে দু'জনে টুক্ করে বাড়ীটির মধ্যে ঢুকে পড়লো। টর্চ্চের আলোয় একে একে সিঁড়ি পার হয়ে উপরে উঠে এসে বারান্দার ধারে একখানি ছোট ঘরে এসে দাঁড়ালো। সহসা মৃদু জলতরঙ্গের মত মিষ্টি একটা শব্দ কানে এসে বাজলো, বহুদূর থেকে যেন একটা বাঁশীর রেশ ধীরে ধীরে কাছে এসে মিষ্টি সুরটা আবার দূরে মিলিয়ে গেল। মধুর সুরের রেশ, ভূতের কঙ্কালের মত ভয়াবহ কিছুই নয়, তথাপি দু'জনের মাথার মধ্যে কেমন যেন শির্ শির্ করে ওঠে, বুকের রক্ত যেন হঠাৎ অত্যধিক ঠাণ্ডার চাপে জমে যাচ্ছে বলে মনে হয়।

সরোজ চীৎকার করে উঠলো—সত্যিই তো ভূতুড়ে বাড়ী দেখছি, কাগজে তাহলে তো মিছে লেখেনি। এখানে আর থেকে দরকার নেই, চল—

হঠাৎ সরোজ যে এমন ভয় পেতে পারে এ ডেভিড্ বিশ্বাস করতে পারলো না। কিন্তু ডেভিড্ কিছু বলার আগেই কানের কাছে কে যেন কেঁদে উঠলো—কাতর কান্নার শব্দ, মৃদু অথচ তীক্ষ্ণ। ধীরে ধীরে সেই স্বর উঠলো, চড়তে চড়তে উদারা, মুদারা, দারা পার হয়ে খাদে নাবলো, তারপর মৃদু অস্পষ্ট হয়ে থম্‌থমে অন্ধকারের বুকে মিলিয়ে গেল।

ডেভিড্ সরোজের হাতখানি চেপে ধরলো, বললে—চল, বেরিয়ে যাই—

ঘটাং করে আচম্বিতে ঘরের পিছনের একটা দরজা খুলে গেল, চমকে

দু'জনে পিছনে তাকিয়ে দেখে একখানি জ্বলন্ত হাত, আঙুলের ডগা থেকে কনুই পর্য্যন্ত কঙ্কাল জ্বল্‌জ্বল্ করছে,—এতটুকু মাংস নেই…মুঠোর মধ্যে একখানি ঝক্‌মকে ধারালো ছোরা। অন্ধকার ঘরের মধ্যে ধীরে ধীরে হাতখানি এগিয়ে তাদের দিকে……।

সরোজ ও ডেভিড্ আর সেখানে দাঁড়ালো না, হুড়মুড় করে ঘরের বাহিরে চলে এল। সামনে বারান্দা, বারান্দা টপকেই—

পথে পড়ে দু'জনে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলো।

* * * *

বালিগঞ্জের এক পার্কে এসে দু'জনে বসলো। রাত সাড়ে দশটার বেশী হবে না। বালিগঞ্জ পল্লী স্তব্ধ স্বপ্নময় হয়ে উঠেছে। মাঝে মাঝে রূপকন্যার কণ্ঠস্বরের মত দু'একটা বাড়ীর নীল আলোয় ভরা ঘর থেকে মিষ্টি গানের সুর ভেসে আস্‌ছে। তারায় ভরা আকাশের নীচে গাছের ফাঁকে ফাঁকে রঙীন বাড়ীগুলি ঘুমন্ত রূপনগরের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে, দখিনা দম্‌কা হাওয়ায় ভেসে আস্‌ছে হাস্নুহানার গন্ধ।

মাঝে মাঝে সেই স্বপ্নপুরীর আবেশ টুটে যাচ্ছে ট্রামের ঘর্ঘরে, বাসের শব্দে, মোটরের হর্ণে।

—তুমি আবার এখানে বস্‌লে যে ?—ডেভিড্ জিগেস করলে।

—ঘণ্টা খানেক হাওয়া খেয়েনি তারপর আবার ফিরে যাব ওই বাড়ীতে।

—আবার ?

হ্যাঁ। এবার যাব ওই হাতের মালিককে ধরতে। ভূতে কখনো ওরকম ছুরি নিয়ে তাড়া করে না, ভূত হলে আস্ত ভূতটাকে দেখতে পেতুম, ওরকম শুধু একখানি হাত নয়। ওটা বোধ হয় একটা গুণ্ডাদের আড্ডা। বাড়ীটা ভূতের

বাড়ী মনে করে ভাড়াটে থাকতে চায় না, গুণ্ডারা দিব্বি রাজত্ব করছে। দলের একটা ধরা পড়লেই সব উৎপাত বন্ধ হয়ে যাবে।

—তখুনি ধরার চেষ্টা করলে না কেন?

—তখন ওরা তৈরী ছিল, আমাদের বিপদের সম্ভাবনা ছিল ষোল আনা। আমরা ভয় পেয়ে পালিয়ে এসেছি দেখে ওরা এখন নিশ্চিন্ত হয়েছে। আবার যে আমরা আজ রাত্রে ফিরে যাব তা' ওরা কল্পনা করতেও পারে না। ওদের অপ্রস্তুত অবস্থায় গিয়ে আমাদের কাজ হাঁসিল করতে হবে। এখন এই ঘাসের বুকে দিব্বি নিশ্চিন্ত মনে ঘণ্টা খানেক ঘুমিয়ে নাও—

দু'জনে ঘাসের বুকে শুয়ে পড়লো। আকাশের বুকে ফুটন্ত চাঁদ আর ভেসে যাওয়া টুক্‌রো টুক্‌রো মেঘের খেলা দেখতে দেখতে কখন তারা সত্যি ঘুমিয়ে পড়েছে। ঘুম ভাঙলো দরোয়ানের ডাকে। পার্কের দরজা বন্ধ করার সময় দরোয়ান তাদের ডেকে তুলে দিয়ে গেল।

দু'জনে আবার চললো সেই বাড়ীটার দিকে।

বেশী পথ নয়, মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই এসে পড়লো। দরজা তেমনি খোলাই আছে, সরোজ ও ডেভিড্ অত্যন্ত সন্তর্পণে ভিতরে ঢুকলো, টর্চ্চ আর এবার জ্বাললো না, নিঃশব্দে উঠান পার হয়ে এলো সিঁড়ির কাছে। সিঁড়ি দিয়ে উপরে না উঠে, সিঁড়ির নীচে ছোট ঘুটঘুটে অন্ধকার ঘাটালের মধ্যে দু'জনে ওঁৎ পেতে বসে রইল।

প্রতিটি মুহূর্ত্ত কেটে যাচ্ছে, এক একটি ঘণ্টার মত দীর্ঘ মনে হয়। বসে থাকতে থাকতে বিরক্তি ধরে যায়, ঝিমুনি আসে। কোত্থেকে ড্রেনের দুর্গন্ধ আসছে, এক একটা বড় ইঁদুর মাঝে মাঝে চলে যাচ্ছে পায়ের উপর দিয়ে। ·· অসহ্য······

কতক্ষণ কেটে গেছে, মৃদু পায়ের শব্দ শোনা গেল। তারপরেই ঘট্ করে একটা শব্দ, সরোজের পাশে দেয়ালটা সরে গিয়ে এক ঝলক আলো বাইরে এসে পড়লো, সঙ্গে সঙ্গে বাহিরে এল দু'জন লোক। প্রথম লোকটি এগিয়ে গেল, পিছনের লোকটি দরজা বন্ধ করার জন্য যেই ফিরেছে, দেখে দু'জন লোক ঘুপ্‌টি মেরে বসে আছে। জিগেস করলে —কে ?

আত্মরক্ষার কোন উপায় নেই দেখে সরোজ পিস্তলের জন্য পকেটে হাত পূরলে, কিন্তু হাত আর বাহিরে আনতে হোল না, লোকটি তার উপর লাফিয়ে পড়লো। ডেভিড্ তাকে সাহায্য করবে কি চোখের নিমেষে ক'জন লোক হুড়মুড় করে এসে পড়লো তাদের উপর। সে একটা খণ্ড যুদ্ধ !

দেখতে দেখতে ডেভিড্ ও সরোজের হাতমুখ বেঁধে তারা ভিতরে নিয়ে গেল। মার খেয়ে তখন তাদের অবস্থা অচৈতন্য হয়ে পড়ার মত।

আলো জ্বলতে দেখা গেল একখানি ছোট ঘর, জোরালো নীল আলোয় সুন্দর দেখাচ্ছে। ঠিক আলোর নীচে দাঁড়িয়ে আছে একজন সুশ্রী বার্মিজ, বয়েস বছর ত্রিশের বেশী হবে না। সরোজ ও ডেভিডের পানে তাকিয়ে হেসে বললে—আপনারা ভদ্রলোক, আমার আশ্রয়ে এসে যখন পড়েছেন, তখন আপনাদের বেশীক্ষণ হাত-পা বেঁধে এই অবস্থায় আমি ফেলে রাখতে চাই না। ভদ্রলোকের সময়ের ও সম্মানের একটা মূল্য আছে তো!

বার্মিজ চুপ করলো, ঘরের এদিক্ থেকে ওদিক্ পর্য্যন্ত একবার পদচারণা করে নিয়ে আবার সামনে এসে দাঁড়ালো। বললে—দেখুন, আপনাদের দু'বন্ধুকে দেখে আমার একটা কথা মনে পড়লো। আমি যখন জাপানে ছিলুম তখন জাপানীদের একটি বিশেষ ঘটনা আমায় মুগ্ধ করেছিল। ঘটনাটী তাদের একটা সামাজিক প্রথা, নাম—হারাকিরি। ব্যাপার আপনাদের খুলে বলা দরকার। যখন কোন সম্ভ্রান্ত জাপানী ভদ্রলোক মনে করে যে, তার জন্যে দেশের কি সমাজের কোন ক্ষতি হয়েছে তখন সে প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য তৈরী হয়। একটা ভাল দিন ঠিক করে আত্মীয়, বন্ধু ও বিশিষ্ট ভদ্রলোকদের নিমন্ত্রিত করে সকলের সামনে তলোয়ারের আঘাতে সে আত্মহত্যা করে। যদি আত্মহত্যার সময় নিজেকে তলোয়ারের আঘাত করতে মমতা হয়ঃ সেই জন্য আগে থেকে একজন অন্তরঙ্গ বন্ধুকে ঠিক করে রাখে, সে বন্ধুর সেই দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে এগিয়ে গিয়ে তলোয়ারের আঘাতে বন্ধুর শিরচ্ছেদ করে। নিজের দেশ ও সমাজকে কত ভালবাসে এবং কতটা মনের জোর থাকলে এম্‌নিভাবে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করা যায় বলুন তো? আমাদের ভারতে দেশদ্রোহী,

সমাজদ্রোহী ও বিশ্বাসঘাতক বড় কম নেই। আমার ইচ্ছা এই হারাকিরি প্রথাটি আমাদের দেশে প্রবর্ত্তন করি, তাহলে বহু দুষ্ট লোকদের হাত থেকে আমাদের দেশ মুক্তি পায়। কিন্তু এ পর্যান্ত মনের মত দু'জন বন্ধু আর আমি খুঁজে পাচ্ছিলুম না, আজ আপনাদের পেয়ে সত্যি আমার আনন্দ হয়েছে। ওই দেখুন আমি জাপান থেকে হারাকিরির এক তলোয়ারও কিনে এনেছি। এখন আপনাদের মধ্যে কে বন্ধু হবে, সেই হচ্ছে কথা !.........

দেওয়ালের ধারে একটি ছোট টেবিল, বক্তা সেই দিকে এগিয়ে গিয়ে টেবিলের উপর থেকে একটি ঝক্‌ঝকে তলোয়ার তুলে নিলে। নীল আলোর আভায় তলোয়ারখানি রঙীন কাগজের তৈরী বলে মনে হচ্ছে। বললে—এই দেখ, হারাকিরির তলোয়ার, এর আঘাতে কত লোক সগৌরবে প্রাণ দিয়েছে,—এর একটি কোপ যে কোন একটি লোকের পক্ষে যথেষ্ট ! যাক্‌ সে কথা, আমি বাজে কথায় আপনাদের মূল্যবান্‌ সময় নষ্ট করতে চাই না, শুভস্য শীঘ্রং ! আপনাদের মধ্যে কে হারাকিরির পুণ্য-প্রথা ভারতে প্রচলন করবেন, সেইটাই আগে স্থির করে ফেলা যাক্‌। আপনারা ভেবে বলুন, আপনাদের আমি পাঁচ মিনিট সময় দিলুম !

সরোজ ও ডেভিড্‌ লোকটির পানে চেয়ে রইল। হাসতে হাসতে যেভাবে সে তাদের জীবন-মরণের আলোচনা করছে তাতে লোকটি যে কতবড় নিষ্ঠুর, সেই কথাই তাদের মনে হচ্ছিল। এখন এর হাত থেকে কি করে রক্ষা পাওয়া যায়, সেই একটা সমস্যা !......

পাঁচ মিনিট পরে হাতঘড়িটা দেখে নিয়ে বার্মিজ বললে—পাঁচ মিনিট তো হয়ে গেল, কিন্তু আপনারা তো কোন কথা বললেন না। আপনাদের মুখ

দেখে মনে হচ্ছে, আপনারা খুব ভয় পেয়েছেন। তা তো হবেই, বাঙালী-জাত ভীরুতার জন্য প্রসিদ্ধ। প্রাণের মায়া ভীরুদের সবচেয়ে বেশী!

সরোজ এবার কথা বললে,—এই অবস্থায় আমাদের ভীরু বলে গাল দেওয়া খুব সোজা, আমাদের বাঁধন খুলে দিন, আমাদের সাহস আছে কিনা দেখিয়ে দিচ্ছি!

বার্মিজ বাধা দিয়ে বললে—যাক্‌গে, বাজে কথা কাটাকাটি করে কোন লাভ নেই, 'টস্' করে দেখা যাক্ আপনাদের মধ্যে কে স্বেচ্ছায় প্রাণ দেবে, বলে পকেট থেকে একটা টাকা বাহির করে আঙুলের টিপে ঠুং করে উপর দিকে ছুড়ে দিলে। টাকাটা ঘুরতে ঘুরতে মাটিতে গিয়ে পড়া মাত্রই পায়ে করে চেপে ধরে সরোজ ও ডেভিডের মুখের পানে তাকিয়ে জিগেস করলে—কার হেড কার টেল্?

সরোজ ও ডেভিড্ কোন কথাই বললে না।

বার্মিজ খানিকক্ষণ তাদের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে হাসলে, বললে—আচ্ছা আমিই ঠিক করে দিচ্ছি, সরোজ বাবুর 'হেড' আর মিষ্টার ডেভিডের 'টেল্', বলে টাকাটা কোন্ দিকে পড়েছে দেখবার জন্য পা সরিয়ে নিলে। টাকাটার রাজার দিক্ উপরে পড়েছিল, বার্মিজ বললে—হেড! তাহলে সরোজ বাবুকেই স্বেচ্ছায় মর্‌তে হবে, মিষ্টার ডেভিড্ আপনি হবেন ওঁর বন্ধু।

সরোজ জিগেস করলে—আপনি আমাদের নাম জানলেন কি করে?

—আপনারা আমার বাড়ীতে এসে অতিথি হবেন আর আমি আপনাদের নাম জানবো না, ইয়াসিন সর্দ্দারকে আপনারা এমন লোক মনে করেন। হিহি করে বক্তা হেসে উঠলো।

—কোন্ ইয়াসিন সর্দ্দার?—ডেভিড্ চম্‌কে উঠলো।

—বার্মিজ ইয়াসিন সর্দ্দার! যার চেয়ে বড় জালিয়াত এখন ভারতবর্ষে আর একজনও নেই, যার পিছনে এগারোখানি বডি-ওয়ারেণ্ট আছে,—আমিই তিনি, পরম নিশ্চিন্ত মনে কলকাতার সহরে বাস করছি এবং এখনও নোট জাল করছি।...কুসিন—।

—হুজুর!—ঘরের বাহিরে থেকে সাড়া এল।

—খাঁচা?

—গুণ্ডা গোছের একজন বার্মিজ ঘরে এসে ঢুকলো, তার হাতে লোহার শিকের তৈরী মস্ত বড় এক খাঁচা, প্রায় সাড়ে পাঁচ ফুট হবে। সরোজের দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতেই কুসিন এগিয়ে গিয়ে খাঁচাটা সরোজের উপর চাপা দিয়ে দিলে,—পা থেকে গলা পর্য্যন্ত খাঁচার মধ্যে পড়লো, মাথাটা শুধু রইল বাইরে।

সরোজের মাথার কাছে ইয়াসিন একখানি চেয়ার এনে রাখলে, ডেভিড্‌কে সেই হাত-পা-বাঁধা অবস্থায় চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে তার ডান হাতের বাঁধন খুলে দিয়ে তলোয়ারখানি তার হাতে দিয়ে বললে—এই নিন্ মিষ্টার ডেভিড্ এই তলোয়ারখানি, খাঁচার পাশ দিয়ে এক কোপ বসিয়ে দিন,—আপনারও ছুটি, বন্ধুরও মুক্তি, আমারও শত্রু মরলো অথচ আমায় খুনী হতে হোল না!

তলোয়ারটার পানে ডেভিড্ চাইল, চাইল সরোজের মুখের পানে, তার মাথাটা কেমন যেন করে উঠলো। তলোয়ারখানা সে ভাল করে ধরতে পারলো না, হাত কেঁপে তলোয়ারখানা কোলের উপর পড়ে গেল, ডেভিড্ চীৎকার করে উঠলো—না-না, আমি পারবো না।

—আচ্ছা, দেখি আপনি পারেন কি না, বলে ইয়াসিন অনুচরটিকে কি যেন বললে, সে একটি ছোট বাক্স নিয়ে এসে টেবিলের উপর রাখলে, বাক্সটার দু দিকে

ইলেক্‌ট্রিকের তার লাগানো। একদিকের তার সুইচ বোর্ডে লাগিয়ে দেওয়া হোল, আরকদিকের তার এনে লাগিয়ে দেওয়া হোল খাঁচার একটি শিকের মুখে। ইয়াসিন সর্দ্দার বাক্সের হাতলটা একবার ঘোরালো, খাঁচার শিকগুলোর উপর দিয়ে চিক্‌মিক্ করে বিদ্যুৎ খেলতে লাগলো। শক্ খেয়ে সরোজ আর্ত্তনাদ করে উঠলো।

ইয়াসিন ডেভিডের পানে চেয়ে বললে আপনার বন্ধু কি রকম কষ্ট পাচ্চেন, দেখছেন তো? এম্‌নি ভাবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে অসহ্য কষ্ট সহ্য করে সরোজ বাবু মরবেন, আর আপনি বন্ধু হয়ে তাই চোখের সামনে দেখবেন? অথচ আপনি ইচ্ছা করলে এক মিনিটে এই যন্ত্রণা থেকে বন্ধুকে মুক্তি দিতে পারেন—সেইটাই কি বন্ধুর কাজ হবে না?

ইয়াসিন আবার বাক্সের হাতলটা দু'পাক ঘুরিয়ে দিলে, যন্ত্রণায় সরোজ সঙ্কুচিত হ'য়ে উঠলো, তার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপতে লাগলো। খাঁচার শিকগুলির উপর দিয়ে চিক্‌মিক্ করে বিদ্যুৎ খেলতে লাগলো। কাতরস্বরে সরোজ বলে উঠলো আমি আর সইতে পারছি না ভাই, তুমি আমার সব শেষ করে দাও . ...

ডেভিড্ ইতস্ততঃ করছিল, বললে কিন্তু......

ইয়াসিন তখন বাক্সের হাতলটা আবার ঘোরাচ্ছে, সরোজ ছিট্‌ফিট্ করে উঠলো, বললে—আর কিন্তু নয় ডেভিড্, ঈশ্বরের দোহাই, তুমি আমায় এই যাতনা থেকে মুক্তি দাও,—সত্যিকারের বন্ধুর কাজ কর, Please, for God's sake!

সরোজের যাতনা দেখে ডেভিড্ কেঁপে উঠলো। চোখের সামনে বন্ধুর এই অসহ্য যাতনা সে দেখতে পারবে না, এর শেষ করতেই হবে, বন্ধু হয়ে বন্ধুর শিরশ্ছেদ করতে হবে। তলোয়ারের একটা আঘাত তারপরেই চিরদিনের মত সব শেষ! চিরদিনের বন্ধু তখন মৃত্যুর ওপারে চলে যাবে!

ডেভিড্ হাতের তলোয়ারখানি একবার ভাল করে দেখলে—এই ধারালো তলোয়ার দিয়ে সে বন্ধুকে হত্যা করবে! না না, সে তা পারবে না! ডেভিড্ থর্ থর্ করে কাঁপতে লাগলো।

যন্ত্রণায় সরোজ চীৎকার করে উঠলো—Quick, David, quick, my friend!

ঠিক সেই সময় একটি মেয়ে ছুটে এসে ঢুকলো ঘরের মধ্যে। ইয়াসিনের কাছে এসে বললে—বাবা, বাবা, পুলিশ এসেছে—

পুলিশ! ইয়াসিন জামার পকেট্ থেকে পিস্তল বাহির করলে, বললে—আসুক পুলিশ, তারা দশ বছর ধরে খুঁজলেও এখানকার পাত্তা পাবে না। (তারপর ডেভিডের দিকে ফিরে) Don't delay Mr. David, strike! দেখছেন না আপনার বন্ধু কি রকম কষ্ট পাচ্ছে!

ইয়াসিন বাক্সের হাতলটা আবার দু'পাক ঘুরিয়ে দিলে। সরোজের যন্ত্রণাকাতর মুখের পানে তাকিয়ে ডেভিড্ তলোয়ারখানা মাথার উপর তুলে ধরলে। পরমুহূর্ত্তেই তার মনে হোল, এতদিনের বন্ধুকে ইয়াসিন সর্দ্দারের জন্য সে হত্যা করবে,—এ হতেই পারে না! মরতে হয় দু'জনেই মরবে। ডেভিডের মাথার মধ্যে আগুন জ্বলে উঠলো। সরোজের ওপাশে ইয়াসিন দাঁড়িয়ে ছিল, ডেভিড্ তারই দিকে তলোয়ারখানি ছুড়ে মারলে। সামনে দাঁড়িয়ে ছোট মেয়েটা, ভয়ে সে ইয়াসিনের গায়ের উপর গিয়ে পড়লো, ইয়াসিন সামলে নেবার আগেই, সেই ধাক্কায় তার হাতের পিস্তল গর্জ্জন করে উঠলো, সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটি টলে পড়ে গেল, আর্ত্তনাদ করে উঠলো—বাবা, তুমি আমায় খুন করলে, উঃ—

দু'হাতে মেয়েটি পাঁজর চেপে ধরলে। ইয়াসিন তাড়াতাড়ি তার পাশে

বসে পড়লো। পাঁজরে গুলিটা গিয়ে লেগেছে। দেখতে দেখতে সব রক্তে লাল হয়ে গেল। যন্ত্রণায় মেয়েটির সুন্দর মুখখানি বিশ্রী বিকৃত হয়ে উঠলো, ধনুকের মত বার কয়েক এপাশ-ওপাশ বেঁকে সে স্থির হয়ে গেল।

মেয়েটির কপালের উপর হাত দিয়ে ইয়াসিন চীৎকার করে উঠলো—মা পান! মা পান!!

পিস্তলের শব্দ শুনে ও দরজা খোলা পেয়ে পুলিশ তখন ঘরের মধ্যে এসে ঢুকেছে। পায়ের শব্দে চোখ তুলে সামনে পুলিশ দেখে ইয়াসিন পাগলের মত চীৎকার করে উঠলো—আমার মেয়েকে আমি খুন করেছি ইনেস্‌পেক্‌টার, তোমরা আমায় গ্রেপ্তার কর— ...

তারপর কি হোল তোমরা বুঝতেই পারছ,—ইয়াসিন সর্দ্দারের বিচার কাহিনী, সে আরেক গল্প।

তবে সে বাড়ীতে আর ভূতের উপদ্রব হয়নি।

সীপ্রার স্বয়ম্বর

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

তোমরা সবাই রামায়ণ পড়েছ, আর জনক রাজার দেশ মিথিলার নামও শুনেছ। এই মিথিলাই জনকনন্দিনী সীতা দেবীর জন্মভূমি। এখানে এমন এক প্রকাণ্ড ধনুক ছিল, তাতে ছিলা পরানো দূরের কথা, কেউ সে ধনুক তুলতেই পারতো না। তাই জনক রাজা প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, যে বীর ধনুক তুলে তাতে ছিলা দিতে পারবেন, সীতা দেবী তাঁরই গলায় মালা দেবেন। অযোধ্যার রাজা দশরথের পুত্র রাম এই বিখ্যাত ধনুক ভেঙ্গে সীতা দেবীকে বিয়ে করেছিলেন। হাজার হাজার বছর পরে এই মিথিলার যিনি হ'লেন রাজা, তাঁর নাম মহাসেন; আর রাজকন্যার নাম সীপ্রা দেবী। রাজরাণী সুমিত্রা দেবী পাঁচ-বছরের মেয়ে সীপ্রাকে রাজার হাতে সঁপে দিয়ে অকালে প্রাণত্যাগ করলেন; আর রাজা চোখের জল মুছে, পরম যত্নে মেয়েটিকে প্রতিপালন করতে লাগলেন। রাজ্য, ঐশ্বর্য্য, সম্মান সবই তাঁর অসার মনে হ'ল।

রাজকন্যা পরম রূপবতী, আশ্চর্য্য সে রূপ! তাঁর রূপ দেখলে চোখ যেন ঝল্‌সে যেতো; বয়সের সঙ্গে সে রূপের জলুস বেড়েই চললো। রাজবাড়ীর সকলেই বলতে লাগলো—জনকনন্দিনী সীতা দেবী আবার মাটী ফুড়ে উঠে এসেছেন।

যেমন রূপের তেজ, রাজকন্যার মনের তেজও তেমনই অসাধারণ। তোষামদে কেউ তাঁকে ভুলাতে পারে না। খোসামুদেদের তিনি দু'চক্ষে দেখতে পারেন না। ছল চাতুরী ক'রে রাজকন্যার চোখে ধূলো দিতে গেলে তার দুর্দ্দশার

একশেষ! যত বড় বিদ্বান বা মানী লোক হন না কেন তিনি, অন্যায় কিছু ব'লে, নাম আর বিদ্যার জোরে রাজকন্যার কাছে এড়িয়ে যাবেন, তার উপায় নেই। দোষ দেখিয়ে দোষীদের থোঁতামুখ ভোঁতা ক'রে দিতে রাজকন্যার এতটুকু চক্ষুলজ্জা নেই। রাজকন্যার দাপটে রাজবাড়ীর সকলেই ভয়ে তটস্থ; রাজার মন্ত্রীরা পর্য্যন্ত কি কথা ব'লে কখন অপদস্থ হবেন, এই ভয়ে সর্ব্বদাই জড়সড়।

রাজার ইচ্ছা—রূপে গুণে বিদ্যায় এমন অপূর্ব্ব কন্যাটিকে—তিনি যোগ্য পাত্রেই সম্পাদন করবেন। কিন্তু রাজার মন্ত্রীদের ইচ্ছা আর এক রকম! তাঁরা বলেন—মিথিলা রাজ্যের এলাকার মধ্যেই রাজকন্যার জন্য বর ঠিক করতে হবে। মিথিলার রাজকন্যা মিথিলার লোক-ছাড়া ভিন্ন এলাকার—অন্য কোন দেশের লোকের গলায় মালা দিতে পারে না। তাতে মিথিলার মানসম্ভ্রম নষ্ট হবে। রাজকন্যারও অগৌরব হবে।

কিন্তু কথাটা শুনে রাজকন্যার মুখে হাসি দেখা গেল। সে হাসি যেন ক্ষুরের ধার! মন্ত্রীদের ভাল লাগলো না। প্রধান মন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণ সিং শিং-এর মত গোঁফজোড়াটা নেড়ে জিজ্ঞাসা করলেন,—"এ কথায় হাসবার কি কারণ পেলে মা!"

রাজকন্যা মুখের হাসি আরও একটু তীক্ষ্ণ করে বল্‌লেন,—"আপনাদের যুক্তি শুনে না-হেসে থাকা যায় কি, মন্ত্রী মশায়!"

শ্রীকৃষ্ণ সিং-এর সহযোগী-মন্ত্রী প্রসাদ সিং চোখ দু'টো কপালে তু'লে রাজকন্যার মুখের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন,—"মন্ত্রীরা যে যুক্তি দেয়, তাতে হাসি পাবার ত কথা নয় রাজকন্যা!"

রাজকন্যা তেমনি হাসিমুখেই বললেন, "আপনাদের যুক্তিতে খুঁত রয়েছে, তাই শুনে হাসি আর সামলাতে পারছি নে। আপনারা বল্‌ছেন—

মিথিলার রাজকন্যা মিথিলাবাসী ছাড়া ভিন্ন দেশের কোন লোকের গলায় মালা দিতে পারে না।"

মন্ত্রীরা সকলেই এবার জোর গলায় একসঙ্গে ব'লে উঠলেন—"হ্যাঁ, পারেনই না ত।"

রাজকন্যা এবার মুখখানি একটু কঠিন ক'রে ব'ললেন,—"তাহ'লে মিথিলারই রাজকন্যা সীতা দেবী ভিন্ দেশ অযোধ্যার রাজপুত্র রামচন্দ্রের গলায় মালা দিতে পেরেছিলেন—কোন্ যুক্তিতে ?

এক ঝাঁক জোঁকের মুখে কে যেন খানিকটা চূণ ঢেলে দিল। মন্ত্রী প্রসাদ সিং কিন্তু সহজে অপদস্থ হবার পাত্র নন, তিনি তখনই নতুন যুক্তি দেখিয়ে বললেন "সে সীতা দেবীর কথা আলাদা। তাঁর বিয়ে নির্ভর করেছিল রীতিমত একটা পণের ওপর, সেটা হচ্ছে ধনুর্ভঙ্গ পণ !"

রাজকন্যা এবার গম্ভীর ভাবে বললেন,—"তাহ'লে আমার জন্যও আপনারা ঐ রকম কোন একটা পণের ব্যবস্থা ক'রে ফেলুন, নৈলে আপনাদের ও যুক্তিও মিছে হবে।"

এর পরই রাজার এক ঘোষণা প্রচারিত হ'য়ে সকলকে অবাক ক'রে দিল ! রাজ্যের সকল লোক সেই ঢ্যাঁড়া শুনে জানতে পারল—আশ্চর্য্য রকমের কোন ক্ষমতা দেখিয়ে যে-লোক রাজকন্যাকে খুসী করতে পারবে—রাজকন্যা সীপ্রা দেবী তারই গলায় মালা দেবেন।

এই ঘোষণার পর আশ্চর্য্য-রকমের ক্ষমতা দেখিয়ে রাজকন্যাকে খুসী করবার জন্য কত লোকই রাজসভায় এসে জুটলেন ; কিন্তু কোন লোক রাজ-কন্যাকে খুসী করতে পারলেন না।

এক ধনুর্দ্ধর এসে জানালেন—"দুনিয়ার আর কোন তীরন্দাজ আমার মত তীর ছুড়তে পারে না।"

রাজকন্যা বললেন,—"ভালো কথা, আপনার ক্ষমতা দেখিয়ে দিন!"

রাজসভার সামনে প্রকাণ্ড উঠানের এক কিনারায় ছিল একটা কদম গাছ। তীরন্দাজ সেটি লক্ষ্য করে ছুড়লেন তাঁর তীর। সেই তীরে গাছটি এফোঁড়-ওফোঁড় হ'য়ে গেল। সভাশুদ্ধ সকলেই অমনি বাহবা দিয়ে উঠলো। লোকটি আবার মিথিলাবাসী; মন্ত্রীরাও খুসী হ'য়ে মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন,—"হ্যাঁ, অদ্ভুত ক্ষমতা বটে! কিয়াবাৎ কেরদানী, তোফা!"

রাজকন্যা হেসে বললেন,—"ছাই! একটা সাঁওতালও এ ক্ষমতা দেখাতে পারে। তীর দিয়ে গাছ ফুটো করা সাধারণের পক্ষে অদ্ভুত বটে, কিন্তু প্রকৃত বীরের নিকট অতি তুচ্ছ।"

তীরন্দাজ-বেচারী মুখ চূণ ক'রে সরে' পড়লো। রাজকন্যার মন্তব্য শুনে মন্ত্রীদের মুখগুলোও অন্ধকার হ'য়ে উঠ্‌লো।

এর পর এলেন এক মস্ত পালোয়ান। তাঁর বিরাট চেহারা দেখে সভাস্থ সকল লোকের তাক্ লেগে গেল! ইয়া সণ্ডা চেহারা, হাতের গুলদুটো যেন নিরেট লোহায় গড়া, বুক যেন এক-জোড়া পাথরের কপাট, উরুৎদুটি যেন কলাগাছের গুঁড়ি; আর চোখের তারাদুটি আগুনে পোড়া ভাঁটার মত জ্বল্‌জ্বলে!

মন্ত্রীরা বললেন,—"অদ্ভুত এঁর দেহের শক্তি, গায়ের জোরে ইনি মিথিলার গৌরব।"

তখন তাঁর ক্ষমতা দেখাবার পালা সুরু হ'ল। গায়ের জোরে লোহার মোটা শিকল ছিঁড়ে, ইস্পাতের সুগোল নিরেট ডাণ্ডা দু'হাতে চোখের পলকে বেঁকিয়ে ফেলে, পিঠের ধাক্কায় প্রকাণ্ড একটা লোহার থাম ঢসিয়ে দিয়ে, হাজার

হাজার লোককে অবাক ক'রে দিলেন। মন্ত্রীরা বললেন,—"এমন অদ্ভুত ক্ষমতা এর আগে কখনো দেখা যায়নি!"

রাজকন্যা মুখ-টিপে হেসে বললেন,—"একটা হাতীকে আনলে এর চেয়েও তার অনেক বেশী ক্ষমতা সকলে দেখতে পেতেন।"

সকলেই বুঝলেন যে, পালোয়ানের ক্ষমতা রাজকন্যাকে খুসী করতে পারে নি। পালোয়ানকেও অগত্যা মাথা চুলকিয়ে স'রে পড়তে হলো। মন্ত্রীরা তারপর যাঁকে আনালেন আরও অদ্ভুত ক্ষমতা দেখাতে,—তিনি একজন মস্ত যোগসিদ্ধ পুরুষ। মন্ত্রীরা বললেন,—"দেবতাদের মত ইনি দিব্যশক্তি পেয়েছেন। কুম্ভক করে মাটী থেকে দশ হাত শূন্যে ঠেলে উঠ্‌তে পারেন; আর আধ ঘণ্টা পর্য্যন্ত ঠায় সেখানে ঝুল্‌তে থাকেন।"

কথাটা শুনেই অনেকে থ' হয়ে গেল; মানুষ মাটীতে ব'সে থাক্‌তে-থাক্‌তে আপনি উঠবে আকাশে—আধ ঘণ্টা ঠায় সেখানে থাকবে ব'সে! তার নেই কোন ঠেকো, নেই আসন! অদ্ভুত! এ কি কখনো সম্ভব হ'তে পারে?

কিন্তু এটা যে হ'তে পারে—যোগী কুম্ভক ক'রে শূন্যে উঠে, আর বিনা অবলম্বনে সেখানে আধ ঘণ্টা থেকে তা' দেখিয়ে দিলেন। সবাই ধন্য ধন্য শব্দে রাজসভা প্রতিধ্বনিত করলেন। মন্ত্রীরা রাজকন্যার দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন,—"কেমন, এবার খুসী? এ কি সত্যই অদ্ভুত ক্ষমতা নয়?"

রাজকন্যা তেমনই মৃদু হেসে উত্তর দিলেন,—"না। একটা পাখীও অনায়াসে আকাশের একশো হাত উপরে উঠ্‌তে পারে, আর এমন কত ঘণ্টা ধ'রেই সে উড়ে বেড়ায়। যে কাজ পাখীর সাধ্য, মানুষের তা অসাধ্য নয় দেখে মন্ত্রীরা তার তারিপ করচেন, এতেই একটু বিস্মিত হবার কথা বটে!"

মন্ত্রীরা মনে মনে রাগে গর-গর করতে লাগলেন, কিন্তু মুখে কিছু বলতে পারলেন না ; অথচ তাঁদের পুঁজিপাটাও সব শেষ হ'য়ে গেল, ঝুলি একদম খালি ! মিথিলার ভিতরে আশ্চর্য্য রকমের ক্ষমতা দেখাবার মত আর একটি প্রাণীও মিললো না। শেষে মিথিলার বাইরে রাজার ঘোষণা প্রচার না ক'রে তাঁরা আর পারলেন না।

কিন্তু বাইরে থেকেও যাঁরা-সব এলেন, তাঁরাও অদ্ভুত কোন ক্ষমতা দেখিয়ে রাজকন্যাকে খুসী করতে পারলেন না। মন্ত্রীরা হাঁফ ছেড়ে যেন বাঁচলেন। মিথিলার রাজকন্যা মিথিলার বাইরে যান, এটা তাঁদের মোটেই ইচ্ছা নয় ; তার চেয়ে রাজকন্যার যদি বিয়ে না হয়—সারাজীবন তিনি আইবুড়ো থাকেন, সেও বরঞ্চ ভাল ব'লে তাঁরা সিদ্ধান্ত করলেন।

শেষে এক দিন একই সময় এক সঙ্গে দুই প্রতিযোগী এলেন রাজসভায়—তাঁদের ক্ষমতা দেখিয়ে রাজকন্যাকে লাভ করতে। দু'জনেরই বয়স প্রায় সমান, দিব্য সুন্দর চেহারা, শ্রীমান্ তরুণ যুবা।

এক জনের মাথায় নৌকার মত টুপি, কাণে মুক্তাগাঁথা বীরবৌলী, গায়ে খুব দামী কিংখাপের পিরাণ, পরণে জমকালো বেনারসী কাপড়, গলায় মুক্তার মালা, কোমরে কিরিচ, পায়ে হরিণের চামড়ার জুতো। যুবা সভায় ঢুকেই বুক ফুলিয়ে বললো,—"এই রাজকন্যা আমারই বধূ হবেন ; আমি অদ্ভুত ক্ষমতা দেখিয়ে এঁকে লাভ করতে এসেছি।"

যুবার সুন্দর চেহারা দেখে যারা মনে মনে খুসী হয়েছিল, এখন তার মুখের কর্কশ কথা শু'নে তারা বিরক্ত হয়ে উঠ্‌লো।

রাজকন্যার কাণেও কথাগুলো যেন তীরের মত বিঁধলো। তিনি সোজা

হয়ে বসলেন, আর জ্বলন্ত দৃষ্টিতে এই অশিষ্ট যুবার পানে একবার চেয়েই মুখখানা ফিরিয়ে নিলেন।

রাজা জিজ্ঞাসা ক'রলেন—"তোমার পরিচয় ?"

যুবা তেমনই অবিনীত নীরস স্বরে উত্তর দিল—"মিথিলা আমার জন্মভূমি, কিন্তু শিক্ষার জন্য এত দিন বিদেশে ছিলুম। শিক্ষা শেষ ক'রে দেশে ফিরেই আমার আশ্চর্য্য ক্ষমতা দেখাতে এসেছি। আমার নাম পেটেল পণ্ডিত।"

মন্ত্রীরা এবার পেটেল পণ্ডিতকে যেন লুফে নিলেন। তার চেহারা দেখে আর স্পর্দ্ধার পরিচয় পেয়ে বুঝলেন, এই যুবক তাঁদের আশা পূর্ণ করবেই। তাকে সমাদরে আহ্বান করলেন।

কিন্তু তখনই পিছন থেকে অন্য যুবক তাঁর শান্ত সুন্দর মুখখানি তুলে বললেন,—"আর আমি ?"

মন্ত্রীরা ভ্রূভঙ্গি ক'রে তাঁর মুখের দিকে তাকালেন। তাঁরা দেখলেন যে, ছেলেটির কাপড়-চোপড়ে বড়-মানুষীর চিহ্নমাত্র নেই। ছিপছিপে লম্বা চেহারা, মুখখানা হাসিমাখা ; কিন্তু তার ভেতরেই এমন একটা ভঙ্গী প্রকাশ পাচ্ছে যে, তা দেখলে বুঝতে পারা যায়—এই যুবকের মনের বল অসাধারণ, সঙ্কল্প অটুট, উৎসাহ অসীম, সাহস অনুপম। মাথায় কোঁকড়া কালো চুল, কিন্তু মাথায় টুপি বা কোন রকম আবরণ নেই। একখানা ধবধবে সাদা কাপড় কোমরে ফের দিয়ে বাঁধা ; ভেতর থেকে চামড়ার খাপে-ভরা একখানা লম্বা তলোয়ারের চকচকে হাতলটা দেখা যাচ্ছে। গায়ে কোন জামা নেই ; কাপড়ের মত সাদা একখানা চাদর দিয়ে পিঠ ও বুক ঢাকা ; চোখ দুটো কান পর্য্যন্ত টানা, আর চক্ষুর তারা আকাশের মত নীল ও স্বচ্ছ, আকাশের তারার মতই স্থির।

মন্ত্রীরা পেটেলকে নিয়েই ব্যস্ত, এই যুবকের কথা তাঁরা গ্রাহ্য করলেন না। রাজাই তখন যুবককে জিজ্ঞাসা করলেন,—"তুমি কে?"

বাঁশীর মত মিষ্টি স্বরে যুবক উত্তর দিলেন,—"আমি বাঙ্গালী, মিথিলার রাজকন্যার পণের কথা শুনে বাঙলা থেকে এসেছি।"

কিন্তু মন্ত্রীদের মনে হল, যুবকের কণ্ঠস্বর যেন রণদামামার ধ্বনি। সেই স্বর শুনে রাজা, রাজকন্যা পর্য্যন্ত সকলের মনে চমক লাগল। তাঁদের বিস্ময়ের কারণও ছিল। বাঙলা দেশের রাজার সঙ্গে মিথিলার রাজার এই সময় ভয়ঙ্কর বিরোধ চলছিল। বাঙলার রাজা দীপঙ্কর মগধ ও মিথিলাকে বাঙলার অধীন ক'রবার সঙ্কল্প ক'রেছিলেন। মগধ তাঁর অদ্ভুত কৌশলে বিনা-যুদ্ধেই বাঙলার অধীনতা স্বীকার ক'রেছে; কিন্তু মিথিলা এখনো স্বতন্ত্র, সে স্বাধীনতা বজায় রেখেছে। তার প্রতিজ্ঞা—কিছুতেই সে বাঙলার অধীনতা স্বীকার করবে না, বরং মগধকে ছিনিয়ে নিয়ে বাঙলাকেও তার তাঁবে আনবে। তাই বাঙলার ওপর মিথিলা এখন খড়্গহস্ত, আর এই জন্যই বাঙলা দেশের এই যুবককে দেখে রাজসভা পর্য্যন্ত বিস্ময়ে স্তব্ধ।

রাজা জিজ্ঞাসা করলেন,—"তোমার পরিচয়?"

যুবক উত্তর দিলেন,—"পরিচয় ত আগেই দিয়েছি রাজা, আমি বাঙলা-মায়ের ছেলে, বঙ্গ আমার জননী; এছাড়া আমার আর কোন পরিচয় নেই। আর এর চেয়ে বড় পরিচয়ই বা কি থাকতে পারে?"

প্রধান মন্ত্রী বিরক্ত হয়ে মুখখানা বেঁকিয়ে জিজ্ঞাসা ক'রলেন—"কি উদ্দেশ্যে তুমি এখানে এসেছ?"

যুবক মৃদু হেসে বললেন,—"পরিচয়ের সঙ্গেই উদ্দেশ্য ত বলেছি। মিথিলার রাজকন্যাকে পত্নীত্বে বরণ ক'রে বাঙলায় নিয়ে যাবার জন্যই—"

যুবার কথায় বাধা দিয়ে প্রধান মন্ত্রী বললেন,—"বাঙলার সঙ্গে মিথিলার বিরোধ চলেছে। শত্রুভূমি বাঙলার সন্তানের স্থান এ রাজসভায় নেই।"

রাজকন্যা এতক্ষণ অপলক নেত্রে এই বাঙালী যুবকের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। মন্ত্রীর কথা তাঁর কাণে প্রবেশ ক'রতেই তিনি চমকিয়ে উঠলেন বটে, কিন্তু তখনই মনের ভাব গোপন ক'রে দৃঢ়স্বরে বললেন,—"আপনার এ কথা সঙ্গত নয় মন্ত্রি! রাজার ঘোষণায় এ রকম কথা প্রচার করা হয়নি; তিনি সব দেশের লোকদেরই প্রতিযোগিতায় আহ্বান করেছিলেন। যে দেশেই এঁদের বাস হোক, এঁরা দু'জনেই ক্ষমতা প্রকাশ করুন।"

রাজা এই সময় বাঙালী যুবককে জিজ্ঞাসা ক'রলেন,—"তুমি কোন্ আশ্চর্য্য ক্ষমতা দেখাতে এসেছ?"

যুবক বললেন,—"ঐ পণ্ডিতের পুত্র যে ক্ষমতা প্রকাশ করবেন, তাতেই আমি জয়লাভ করব; এই রকমই আমার আশা।"

পণ্ডিতের পুত্র পেটেল বললেন,—"আমার বাবা ছিলেন বিশ্ববিজয়ী মহা-পণ্ডিত, আমি তাঁর পুত্র এবং শিষ্য; পাণ্ডিত্যে আমাকে পরাস্ত করবার যোগ্যতা পৃথিবীতে কারও নেই।"

বাঙালী যুবক বললেন,—"বৃথা তর্কে সময় নষ্ট করবার কি দরকার? পরীক্ষা আরম্ভ হোক।"

পেটেল পণ্ডিত তখন সদম্ভে বললেন,—"তবে সবাই স্তব্ধ হয়ে শুনুন; আমি ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান সব বলতে পারি। আমি যা বলবো, তার চেয়ে আশ্চর্য্য কিছু নেই। আমি বলছি—আজ রাত ঠিক বারোটার সময় ভয়ঙ্কর একটা দুর্য্যোগ হবে, আর সেই দুর্য্যোগে বজ্রাঘাতে আমাদের রাজা মারা পড়বেন। উনি এই দৈবনির্ব্বন্ধ রদ ক'রে আমাকে পরাস্ত করুন, শক্তির পরিচয় দিন।"

এমন ভয়ঙ্কর কথা শুনে সভাশুদ্ধ সবাই নিস্তব্ধ! রাজার মুখ ভয়ে শুকিয়ে গেল, রাজকন্যার বুক টিপ্-টিপ্ করতে লাগল। কিন্তু পেটেলের প্রতিদ্বন্দ্বী বাঙালী যুবক তখনই দৃঢ়স্বরে বলে উঠলেন,—"আপনার পরাজয় সুনিশ্চিত। রাজা দীর্ঘজীবী হোন, তাঁর মৃত্যু হবে না; কালই তিনি হাসিমুখে আমাকে কন্যা সম্প্রদান করবেন। আমার মিথিলায় আসার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে।"

রাজকন্যা বোধ হয় ভগবানের নিকট এই কামনাই করলেন।

কিন্তু পেটেল এবার চীৎকার ক'রে বল্লেন,—"যদি আমি হারি, তাহ'লে তোমার ক্রীতদাস হব—ব'লে রাখছি।"

বাঙালী যুবক একটু হেসে বললেন,—"এখন থেকেই সেজন্য প্রস্তুত হও পণ্ডিত! পণ্ডিতকে দাসরূপে লাভ করা সৌভাগ্যের বিষয় বটে!"

মন্ত্রীরা বলিলেন,—"তাই ত, এ যে ভারী একটা উৎকট সমস্যায় পড়া গেল!" কিন্তু তাঁদের মুখ দেখে মনে হচ্ছিল যে, মিথিলার সেই পণ্ডিত যুবকের মুখ রাখতে রাজাকে যদি বজ্রাঘাতে নিহত হ'তে হয় তাও বরং ভাল, কিন্তু রাজা বেঁচে থেকে যদি বাঙলার ঐ সন্তানের মনস্কামনা পূর্ণ হওয়ার সুবিধে ক'রে দেন—তবে তাঁদের আক্ষেপের সীমা থাকবে না।

রাজকন্যা এর পর বললেন,—"এখন তাহ'লে সভা ভঙ্গ হোক। রাত ঠিক এগারোটার সময় আবার সভা বসবে। আর এঁদের দু'জনকেই নজরবন্দী করে রাখা হোক; ঐ সময় সভায় আনা হবে। আমি স্বীকার করছি—এঁদের মধ্যে যিনি জয়ী হবেন, তাঁরই কণ্ঠে আমি বরমাল্য অর্পণ করবো।"

* * *

সন্ধ্যার সময় পেটেল পণ্ডিত তাঁর বাসাঘরে ব'সে রাজার ভাগ্যগণনা করছিলেন। সহসা তাঁর সামনে এসে দাঁড়ালেন রাজকন্যা সীপ্রা; তাঁর পেছনে

খোলা-তলোয়ার হাতে যোদ্ধৃবেশধারিণী একদল প্রহরিণী। রাজকন্যাকে হঠাৎ সেখানে দেখে ভয়ে পেটেল পণ্ডিতের মাথা ঘুরে গেল।

রাজকন্যা বললেন,—"ভয় নেই ; একটা কথা জানতে এসেছি।"

পেটেল পণ্ডিত নির্ব্বাক্, রাজকন্যার মুখের উপর তাঁর নির্নিমেষ দৃষ্টি!

রাজকন্যা বললেন,—"আপনি বলেছেন, রাত্রি ঠিক বারোটার সময় বজ্রাঘাতে বাবার প্রাণ—" রাজকন্যার মুখে কথা বেধে গেল।

পেটেল বললেন,—"যা বলেছি, তার নড়-চড় হবে না। এ পর্য্যন্ত একুশবার রাজার ভাগ্য গণেছি, ফল একই দেখছি—বজ্রাঘাতে অপমৃত্যু।"

রাজকন্যা জিজ্ঞাসা করলেন,—"কোন প্রতীকার নেই ?"

পেটেল মাথা নেড়ে বললেন,--"না ; প্রতীকার থাক্‌লে সে কথা আগেই জান্‌তে পারতেন।"

রাজকন্যা আবার জিজ্ঞাসা করলেন,—"মাটীর নীচে কোন ঘরে যদি বাবাকে লুকিয়ে রাখি ?"

পেটেল বললেন,—"তা রাখতে পারেন ; কিন্তু প্রতিকূল দৈব তাতে অনুকূল হবে না।"

মলিনমুখে রাজকন্যা শেষবার জিজ্ঞাসা করলেন,—"কোন উপায় নেই তাহ'লে ?"

পেটেলের গলার স্বর ঝন্-ঝন্ করে উঠ্‌লো—"না। তাঁর মৃত্যু অনিবার্য্য ; তবে তোমার কোন ভয় নেই, তুমি সুখী হবে রাজকন্যা। তোমার ভাগ্যে রাজমহিষীর সম্মান সুস্পষ্ট দেখচি।"

রাজকন্যা তখনি ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে সেই স্থান ত্যাগ ক'রলেন! তাঁর প্রহরিণীরাও তাঁর অনুসরণ করলো।

*　　　*　　　*

বাঙলার সন্তান বাঙ্গালী যুবকটি তাঁর বাসার ভিতরে তখন ধীরে ধীরে পায়চারী করছিলেন। হঠাৎ একদল প্রহরিণী-পরিবেষ্টিতা রাজকন্যাকে সেই ঘরে প্রবেশ করতে দেখে তাঁর মুখখানা আনন্দে উজ্জ্বল হ'য়ে উঠলো। তাড়াতাড়ি বেতের আসনখানা তিনি এগিয়ে দিয়ে বললেন,—"আমার সৌভাগ্য, বসুন আপনি।"

রাজকন্যা গম্ভীর স্বরে বললেন,—"বস্‌তে আসিনি এখানে, একটা কথা জানতে এসেছি।"

মুখে কিছুমাত্র কৌতূহলের চিহ্ন প্রকাশ না ক'রেই বাঙ্গালী যুবক মৃদুস্বরে বললেন,—"বলুন।"

রাজকন্যা বললেন,—"আপনি বলেছেন—আমার বাবার অপমৃত্যু হবে না।"

যুবক বললেন,—"আমার কথা মিথ্যা নয়। আপনি তা অনায়াসে বিশ্বাস ক'রতে পারেন।"

রাজকন্যার মনে কথাগুলো যেন যথেষ্ট শক্তি সঞ্চার করলো। একটু থেমে তিনি আবার বললেন,—"কিন্তু পেটেল পণ্ডিত বলছেন, বজ্রাঘাত হবেই, আর তাতেই তাঁর মৃত্যু।"

যুবক রাজকুমারীর মুখের দিকে চেয়ে বললেন,—"কিন্তু মৃত্যু তাঁর হবে না রাজকন্যা, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।"

বুদ্ধিমতী রাজকন্যা এ-কথায় যেন কেমন ধোঁকায় প'ড়লেন; এবার সন্দিগ্ধ স্বরে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন,—"তাহ'লে বজ্রাঘাত হবে—আপনিও এ-কথা স্বীকার করচেন?"

যুবক জানালেন,—"বজ্রাঘাত থেকে আপনার বাবাকে বাঁচাবো বলেই আমি বাঙলা থেকে ছুটে এসেছি। আর আমার আশ্চর্য্য ক্ষমতার এইটিই হচ্ছে পরীক্ষা।"

কথাটা শুনে রাজকন্যা কিছুক্ষণ কাঠ হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর আস্তে আস্তে বললেন,—"তাহ'লে বাবার সম্বন্ধে আপনি কি করতে চান? তাঁকে কি ভাবে আমরা রাখবো?"

যুবক বললেন,—"আপনি ভাববেন না, আমি তার সব ব্যবস্থাই ক'রে রেখেছি।"

* * *

সন্ধ্যার একটু পরেই আকাশে দুর্য্যোগ দেখা দিল। দেখ্‌তে দেখ্‌তে সমস্ত আকাশ মেঘে আচ্ছন্ন হ'ল! চারদিকেই একটা কেমন থম্‌থমে ভাব। এই দুর্য্যোগ মাথায় ক'রে লোকজন সব সভায় এল ছুটে; সকলের ভাবনা—কি হয়, কি হয়; কে হারে, কে জেতে!

যথাসময় রাজা এলেন, রাজকন্যা এলেন, মন্ত্রী, সভাসদ, পাত্র-মিত্র সবাই যে যাঁর জায়গায় বসলেন। পেটেল পণ্ডিত আর বাঙালী যুবক সভায় ঢুকতেই সভাশুদ্ধ সকলেই তাঁদের দিকে চেয়ে রইল।

বাঙালী যুবকের আদেশে সভার বাইরের আঙিনায় একটা তাঁবু উঠ্‌লো। সেই তাঁবুটি দেখিয়ে তিনি বললেন,—"রাজা এবার ঐ তাঁবুর ভিতরে গিয়ে বসবেন।"

মন্ত্রীরা জিজ্ঞাসা করলেন,—"কেন?"

বাঙালী যুবক বললেন,—"বাঁচবার জন্য।"

পেটেল পণ্ডিত টিটকিরী দিয়ে বললেন,—"না, মৃত্যুর মুখে এগোবার জন্য।"

বাঙালী যুবকের অনুরোধে রাজা সিংহাসন ছেড়ে তাঁর হাতখানি ধ'রে তাঁবুর দিকে এগুলেন। রাজাকে উঠতে দেখে সভার সমস্ত লোক উঠে দাঁড়াল। রাজা গম্ভীর মুখে তাঁবুর মধ্যে প্রবেশ করলেন। প্রজাদের মুখে উদ্বেগের চিহ্ন, তারা সকলে যেন ভয়ে আড়ষ্ট !

একটু পরেই আকাশে যেন দেব-দানবের যুদ্ধ বেধে গেলো। মেঘের কি ভয়ঙ্কর গর্জ্জন ! আকাশের বুক চিরে মুহুর্মুহু বিদ্যুতের আভা ফুটে বেরুতে লাগলো, হুড়হুড় শব্দে বৃষ্টির ধারা বইলো ; দেখতে দেখতে মিথিলায় যেন প্রলয়ের সূচনা হ'ল !

এই দুর্য্যোগের মধ্যে কালো রঙের একটি বিড়াল কোলে ক'রে বাঙালী যুবক তাঁবু থেকে বেরিয়ে এলেন। সমস্ত লোক তাঁর পানে অবাক হয়ে চেয়ে রইলো। কিন্তু যুবক কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ না ক'রে সভার ভিতরে ঢুকে তাঁর জায়গায় বসলেন। ঠিক এই সময় সবার কাণে তালা লাগিয়ে—ভীষণ আভায় সকলের চক্ষু ধাঁধিয়ে তাঁবুর ওপরে কড়-কড় শব্দে বাজ পড়লো !

কত লোক মূর্চ্ছা গেল ভয়ে, কত লোক চেঁচিয়ে উঠলো ভগবানের নাম নিয়ে, কাছের কত লোক বাজের জ্বালায় মূহ্যমান হ'য়ে কাঠের মত স্থির হ'য়ে রইলো !

পেটেল পণ্ডিতের কর্কশ চীৎকার বুঝি সভাশুদ্ধ সকলকে প্রকৃতিস্থ ক'রে দিলে। পেটেল বলে উঠলেন,—"কেমন আমার ক্ষমতা, এখন তাঁবুতে গিয়ে দেখ, রাজা বেঁচে নেই, ম'রে কাঠ হ'য়ে আছেন।"

মন্ত্রীরা রাজার শরীর-রক্ষীদের নিয়ে তাড়াতাড়ি তাঁবুর ভিতরে গেলেন, তারপর রাজার প্রাণহীন দেহ নিয়ে আবার সভায় ঢুকলেন। প্রধান মন্ত্রী কান্নার সুরে ঘোষণা করলেন,—"সর্ব্বনাশ হয়েছে, মহারাজ বজ্রাঘাতে মারা গিয়েছেন।"

প্রজারা হাহাকার ক'রে উঠলো। রাজকন্যার মুখে কথা নেই। এই সময় বাঙালী যুবক বললেন,—"মহারাজ ঠিক আছেন, ওঁকে সিংহাসনে বসিয়ে দিন।"

প্রধান মন্ত্রী বললেন,—"তুমি পাগল! দেখছ না—রাজার দেহ অসাড় হ'য়ে গেছে। এতে প্রাণের কোন স্পন্দনই নেই।"

রাজকন্যা বললেন,—"উনি যা বলছেন তাই করুন। রাজাকে সিংহাসনে বসিয়ে দিন।"

রক্ষীরা অতিকষ্টে কোন রকমে রাজাকে সিংহাসনে বসিয়ে চেপে ধ'রে রইল। বাঙালী যুবক তখনি তাঁর কোলের বিড়ালটি সিংহাসনের সামনে হাতীর দাঁতে তৈরী আধারটির ওপরে রাখলেন।

পেটেল পণ্ডিত এই সময় চেঁচিয়ে উঠলেন,—"হার হ'ল কার? ক্রীতদাস হ'ল কে? রাজকন্যা এখন কার?"

কালো বিড়ালটা হঠাৎ আধারের উপর নেতিয়ে পড়লো, আর সদ্য ঘুম-ভাঙার পর মানুষ যেমন ক'রে চায়, ঠিক তেমনই ভাবে সিংহাসনে রাজার আড়ষ্ট দেহের চোখ দু'টো গেল খুলে—সঙ্গে সঙ্গে সারা দেহখানা উঠলো ন'ড়ে।

ভয়ে-বিস্ময়ে-আনন্দে নানা ভাবে নানা লোক কোলাহল সুরু ক'রে দিল।

বাঙালী যুবক এইবার দিলেন পেটেলের প্রশ্নের উত্তর,—"হারলে তুমি, হ'লে ক্রীতদাস, রাজকন্যা আমার! রাজার আত্মাকে এই মরা-বিড়ালের দেহের মধ্যে রেখে, বজ্রের আঘাত থেকে আমি ওঁকে রক্ষা করেছি। ওঁর আত্মা ওঁর দেহে যেতেই বিড়ালও ঢলে পড়েছে।"

পেটেল তখন কাঁপতে কাঁপতে বিজয়ী যুবকের পায়ের তলায় ব'সে বললেন, —"সত্যই আমি হেরেছি। আমি তোমার ক্রীতদাস।"

মন্ত্রীরাও ক্ষুব্ধ হয়ে ব'লে ফেললেন,—"সত্যই এ ক্ষমতা অদ্ভুত!"

রাজকন্যা বললেন—"তুমি আমাকে খুসী করেছ, রাজ্যের রাজার জীবন দিয়েছ ; রাজকন্যাকে লাভ ক'রে এ রাজ্যও তুমি ভোগ করো।"

যুবক তখন শান্ত স্বরে বললেন,—"রাজকন্যার কল্যাণে আমার স্বপ্ন আজ সত্য হ'ল। মগধের সঙ্গে মিথিলাও বাঙলার সঙ্গে মিশে গেল।"

রাজা এই সময় বিদ্যুতের বেগে সিংহাসন থেকে উঠে বললেন,—"তুমি কে ? সত্য বল—তুমি কে ?"

শান্ত ও সংযত স্বরে বাঙালী যুবক উত্তর দিলেন,—"আমি দীপঙ্কর ; রাজ্যের পর রাজ্য জয় ক'রেও তৃপ্তি পাই নি, তাই রাজলক্ষ্মীর সন্ধানে এসেছি মিথিলায়।"

রাজকন্যা তাড়াতাড়ি তাঁর আসন থেকে উঠে নিজের গলার গজমতি হার-ছড়াটি রাজা দীপঙ্করের গলায় পরিয়ে দিয়ে বললেন—"এ রাজ্যও তুমি জীবন দিয়ে জয় ক'রেছ ব'লেই রাজলক্ষ্মীও তোমাকে ধরা দিলে রাজা !"